বাংলাদেশে বন্যা : পরিপ্রেক্ষিত কারণ ও করণীয়

এম. এম. আকাশ*

১. বন্যা'৮৮—পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ প্রায়ই বলতেন যে বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতি গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ভ্রকুটী এবং হাসির উপরই অনেকখানি নির্ভরশীল। আর ছোট বেলায় আমরা আমাদের সর্ববিদ্যার আকর সুবৃহৎ রচনার বইগুলিতে পড়েছি বাংলা-দেশের কৃষি হচ্ছে মৌসুমী জল-বায়ুর ক্রীড়া।

সুতরাং বাংলাদেশে বছর বছর বন্যার প্রাদুর্ভাব কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রতিবছর বর্ষাকালে এদেশের নদী-নালা খাল-বিল টই-টুম্বুর হয়ে ভরে উঠে। অতঃপর দুই-কুল উপচে পড়া পানি যত্র-তত্র প্রবেশ করে। মানুষের প্রচুর অসুবিধা সৃষ্টি হয়। প্রচুর সম্পদ বিনষ্ট হয়। জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে এই ধরনের মৌসুমী বন্যার সঙ্গে আমরা নদী অববাহিকার মানুষেরা জন্মাবধি পরিচিত।

কিন্তু বন্যা '৮৮ সেরকম ধরনের কোন গতানুগতিক মৌসুমী বন্যা ছিল না। এর অস্বাভাবিকত্ব নিহিত আছে এর রেকর্ড ভঙ্গকারী স্থায়ীত্ব, আকস্মিকতা, বিস্তৃতি এবং গভীরতার মাঝে। এ বছর দেশের ৪৭টি জেলার ২৯৩টি উপজেলা প্লাবিত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ২ কোটি ১০ লাখ মানুষ যার মধ্যে ১ কোটিই হলো কৃষক। এ পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৭০ জন। গবাদি পশু মারা গেছে প্রায় এক লাখ। খাদ্য শস্যের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৪ লাখ টন। কারো মতে টাকায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকার

* অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনেক উর্ধে (স্মর্তব্য যে গত বছর ১৯৮৭ সালের বন্যায় আথিক ক্ষয়ক্ষতির মোট মূল্য ছিল ৩০০০ কোটি টাকার সমান)। (দেখুন-২৬, ২৭, এবং ২৯)।

কিন্তু এসব পরিসংখ্যান আমাদের সামগ্রীক উপলব্ধির জন্য যথেষ্ট নয়। আমরা যখন দেখি ঢাকা শহরের ব্যস্ততম এলাকা মতিঝিলের সদর রাস্তায় নৌকা চলছে অথবা মীরপুর রোডে ছোট লঞ্চ বা ট্রলার চলছে অথবা যখন শুনি যে ঢাকা শহরের অভিজাততম এলাকা গুলশান-উত্তরার মানুষেরা পানিবন্দী হয়ে আছে অথবা আরো চমকপ্রদ খবর "রাষ্ট্রপতির গৃহে পানি প্রবেশ করেছে" তখনই এবং তখনই আমাদের উপলব্ধিতে বন্যার মুখে আমাদের দেশজোড়া নিরুপায় অসহায়ত্ব তীব্রভাবে উন্মোচিত হয়। আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে বন্যা এবার কাউকেই পরিত্রাণ দেয়নি। এমনকি চিরবিপদমুক্ত 'এলিটদেরও' নয়।

সুতরাং বলা যায় বর্ষা মৌসুমের যে বন্যা ছিল এদেশের মানুষের জন্য স্বাভাবিক ঘটনা, কখনো বা কিছুটা ইপ্সিতও বটে। কারণ স্বল্প বন্যা গাছ-পালা ফসলের উন্নতি ঘটায়। জমিকে পলিমাটি সমৃদ্ধ ও সরস করে, নদ-নদীতে নৌপথে যাত্রা সহজতর করে এবং মাছ-ভাতে বাংগালীর জন্য মাছের সম্ভার বয়ে আনে। কিন্তু আজ আর সেই বন্যা স্বাভাবিক ইপ্সিত ঘটনা নয়। বন্যার মাত্রা আজ এমন এক পর্যায়ে পেঁছে গেছে যে তা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এর পরিণতি হবে সুদূরপ্রসারী এবং ভয়াবহ। বছর বছর এরকম ভয়াবহ মাত্রায় বন্যা হতে থাকলে আমাদের এই দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সবটুকুই চলে যাবে ক্ষয়-ক্ষতি নিবারণ ও পুনর্বাসন খাতে। এক হিসাবে জানা যায় যে ১৯৫৪ সাল থেকে এ যাবৎ ৩৪ বছরে মোট ২৭ বার এদেশে বন্যা হয়েছে। তারমধ্যে ৯ বারের বন্যা ছিল ভয়াবহ, ৭ বারের বন্যা মাঝারি এবং ১১ বারের বন্যা ছিল হাল্কা ধরনের। এসব বন্যায় ফসল ও অন্যান্য সম্পদের ক্ষতি হয়েছে সাড়ে ষোল হাজার কোটি টাকারও উপরে। বস্তুতঃ প্রতিটি বন্যার পর এইসব ক্ষতির বোঝা আমাদেরকেই প্রতিবার বহন করতে হয়েছে ও হচ্ছে। অথচ একবারে এই পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হলে বন্যা সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান মোটেও অসম্ভব ছিল না।

প্রতি বছর এরকম বন্যা হতে থাকলে এক সময় আমাদের স্থানীয়

উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবেন। এরকম অনিশ্চিত পরিবেশে বিনিয়োগের আক্ষরিক অর্থই তখন দাঁড়াবে 'কষ্টার্জিত পয়সা জলে ফেলে দেয়া'। কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের খাদ্য ঘাটতির পেছনে একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে উফশী চাষে চাষীদের অনীহা এবং চাষীদের এই অনীহার পেছনে বস্তুতঃ অনেক জায়গাতেই কাজ করছে বন্যাজনিত অনিশ্চয়তা। স্বভাবতঃই এরকম অনিশ্চিত পরিবেশে চাষীরা ব্যয়বহুল উফশী বিনিয়োগে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছেন। ফলে একর প্রতি ফলন আর বাড়ছে না। খাদ্য ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে এবং বছর বছর বন্যার প্রত্যক্ষ ক্ষয়-ক্ষতি তাকে আরও তীব্রতর করছে। জাতি হিসাবে বাধ্য হচ্ছি আমরা বহিঃবিশ্বে আমাদের ভিক্ষুকের হস্ত প্রসারিত করতে। ক্ষুন্ন হচ্ছে আমাদের জাতীয় সার্বভৌমত্ব এবং ধীরে ধীরে সমগ্র জাতিকে আজ গ্রাস করতে চলেছে এক মর্মান্তিক করুন ভিক্ষুক মনোবৃত্তি।

বন্যার প্রভাব তাৎক্ষণিক ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। তার সুদূরপ্রসারী ফলাফল রয়েছে। বিশেষতঃ বন্যা যখন তার নির্দিষ্ট স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করে যায় তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় খুবই মারাত্মক। বন্যাক্রান্ত এলাকা সমূহের জনগণের উপর বন্যার যেসব বিস্তৃত পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সেই বিষয় নিয়ে বিশদ 'স্টাডি' খুবই দুর্লভ। এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হচ্ছে অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, এ, টি, এম আমিনুল ইসলাম এবং সনৎ কুমার সাহা রচিত গবেষণা কর্মটি। ১৯৮৫ সালে এই গবেষণার অংশ হিসাবে বন্যাক্রান্ত ৭টি এলাকায় মোট ১৮১৯টি পরিবারের উপর বেশ তথ্যবহুল একটি জরিপ চালানো হয়েছিল। এই তথ্যবহুল জরিপ থেকে বন্যার বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যে সব উল্লেখযোগ্য সত্য প্রকাশিত হয়েছে তা নীচে লিপিবদ্ধ করা হলো—

১। সব কিছু যখন বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় তখন সবচেয়ে বেশী অসুবিধা সৃষ্টি হয় দিনমজুর পরিবারদের জন্য। যেহেতু সে দিন আনে দিন খায়। সেজন্য কৃষি কাজের এবং নির্মাণকর্মের অভাবের দরুণ তার রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। তাই বন্যায় এই শ্রেণীর লোকদের অসহায়ত্বই সবচেয়ে প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

২। বন্যার পানি দীর্ঘায়িত হলে ক্ষুদে কৃষকরা প্রায়ই জমি-জমা

ঘটি-বাটি ইত্যাদি স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দিতে বা বিক্রী করতে বাধ্য হয়। ফলে সমাজে শ্রেণী বৈষম্য বৃদ্ধির অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া আরো ত্বরান্বিত হয়।

৩। গ্রামের দরিদ্র লোকদের শেষ সম্বল ঘর-বাড়ি, ক্ষুদ্র একখণ্ড জমি, ইত্যাদিও যখন বন্যার ফলে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় তখন সর্বস্ব খুইয়ে তাদের অনেকেই শহরের অনিশ্চিত আশ্রয় শিবিরের দিকে ধাবিত হন। ফলে দরিদ্র মানুষের শহরমুখী মিছিলের দৈর্ঘ্য আরো বৃদ্ধি পায়।

৪। বন্যা পরবর্তী বেশীরভাগ অঞ্চলেই খাবার পানি ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থায় সংকটের দরুণ মহামারী-রোগ-ব্যধির বিস্তার ঘটে। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় অসংখ্য মানুষ স্বল্প অসুখেই মৃত্যুবরণ করে। এমনকি সামান্য পেটের পীড়াতেই অজস্র মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

৫। বন্যা যদি খুব তীব্র হয়, ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি যদি বিপুল এবং অপূরণীয় হয়, সর্বোপরি সরকার ও বেসরকারী ত্রাণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যথাসময়ে এবং যথোপযুক্ত মাত্রায় খাদ্যশস্য হস্তান্তর যদি না ঘটে তাহলে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বহু লোক বিশেষতঃ দরিদ্ররা রোগে অনাহারে ভুগে মৃত্যুবরণ করে।

৬। জরিপে দেখা গেছে যে সাধারণতঃ বন্যাক্রান্ত এলাকার মানুষ সহসাই এলাকা ছেড়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যান না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তারা ভিটে আঁকড়ে অথবা ভিটের কাছাকাছি কোন উচু জায়গায় অবস্থান গ্রহণের জন্য চেষ্টা করেন। একমাত্র যখন তাদের শারীরিক অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে তখনই তারা স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

৭। বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলির অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড সর্বদাই কিছুটা নিম্নাবস্থানে (Low level) থাকে। কারণ যেসব লোকের হাতে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ রয়েছে তারা বন্যার আশংকাবহুল স্থানে তা বিনিয়োগে উৎসাহী থাকেন না।

৮। বন্যাক্রান্ত অঞ্চলের কৃষকরা চিরায়ত কৃষি পদ্ধতির বাইরে আসতে ভয় পায়। বন্যাকে অগত্যা মেনে নিয়ে বন্যাবাহিত পলিমাটির সুযোগমত সদব্যবহার করে পুরোনো জাতের ফসলগুলিই বছরের পর

বছর তারা ফলিয়ে আসছেন। এক্ষেত্রে উৎপাদনের সর্বোচ্চকরণে তাদের আস্থা নেই। "ঝুকি কমানোই" তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রধান মাপকাঠি হিসাবে কাজ করে।

৯। বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলিতে জরিপে দেখা গেছে যে বন্যা পর-বর্তীতে দুইভাবে রিলিফ বন্টন করা হয়েছে। সরকারী রিলিফ এবং বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে বন্টিত রিলিফ। সাধারণভাবে অভিমত হচ্ছে মোট রিলিফ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত ছিল না। যদিও সরকারী রিলিফের পরিমাণ বেসরকারী রিলিফের তুলনায় বেশী ছিল কিন্তু সরকারী রিলিফের বন্টন ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত ছিল। (১৯৮৪ সালের বন্যার রিলিফ কর্মের এই অভিজ্ঞতাটিই হয়তো বর্তমান বন্যায় দাতা দেশগুলিকে সরকারী চ্যানেলে রিলিফ বিতরণ সম্পর্কে আরও সন্দিহান করে তুলেছে। এবং এবারই তাই রিলিফ বিতরণে এন, জি, ও-দের প্রাধান্য সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। যদিও অবশ্য পুরো পরিসংখ্যান এখনো আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি)।

১০। জরিপকারীরা আরো লক্ষ্য করেছেন যে বন্যার মত দুর্যোগ-পূর্ণ পরিস্থিতিতে একান্ত মানবেতর অবস্থাতে হলেও বেঁচে থাকার এক অদ্ভুত ক্ষমতা জনগণের বিশেষতঃ গরীব মানুষের রয়েছে। তাদেরকে দেখে পরাজিত মনে হয়নি এবং ভবিষ্যতের যে কোন দুর্যোগ মোকাবিলা করার মত সাহস তারা হারায়নি।

বন্যা সমস্যার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ এবং দূরবর্তী যেসব পার্শ্ব প্রতি-ক্রিয়ার বিবরণ আমরা উপরে উল্লেখ করলাম এর তালিকা আরও দীর্ঘ করার কোন প্রয়োজন নেই। কোন বর্ণনা কোন পরিসংখ্যানই সর্বস্ব হারানো মানুষের মর্মবেদনাকে তুলে ধরতে সক্ষম নয়। বস্তুতঃ বন্যা—'৮৮ আমাদের জাতীয় উপলব্ধিকে আজ এমন মাত্রায় নিয়ে গেছে যেখানে আমরা আজ আর নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাদের আজকে বন্যার প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে হবে। কেন বন্যা হয়? বন্যা কি অনিবার্য? যদি সেটা সত্য না হয় তাহলে বন্যা সমস্যার সমাধানের উপায় কি? এর কি কোন দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী সমাধান আছে? না কি স্বল্পমেয়াদী সমাধানই বেশী প্রয়োজন? যতদিন পরিপূর্ণ সমাধান না হচ্ছে ততদিন বন্যার সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে সহাবস্থানের জন্য আমরা কি করতে পারি? এসব বিভিন্ন ধারায়

বিভিন্ন ধরনের সমাধান প্রচেষ্টা অতীতে কি নেয়া হয়েছিল? নেয়া হলে কোথায় এদের গলদ-ব্যর্থতা? এসব ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি শিক্ষা লাভ করছি? ইত্যাদি হাজার রকম প্রশ্ন হাজারো শিক্ষিত চিত্তকে আজ আলোড়িত করছে। আর সাধারণ অশিক্ষিত গরীব মানুষ অতোটা সুবিন্যস্তভাবে চিন্তা করতে না পারলেও—তাদের মধ্যেও সৃষ্টি হয়েছে পথ খোঁজার তাগিদ। এদিক থেকে দেখলে দেখা যায় যে বন্যা—'৮৮ তার অগতানুগতিকতার দরুণ একদিকে যেমন আমাদের প্রচুর দুঃখ কষ্টের কারণ হয়েছে তেমনি অন্যদিকে তা আমাদের প্রথাসিদ্ধ উদাসীনতাকে চমকে জাগ্রত করে দিয়েছে। বন্যা—'৮৮ আমাদের জাতির জন্য তাই দৃষ্টি উন্মোচনকারী একটি ঘটনা হিসাবে অক্ষয় হয়ে থাকবে যদি আমরা এই জাগ্রত অবস্থাকে মরে যেতে না দেই এবং বন্যা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে এই চেতনাকে সক্রিয় কার্যকর উদ্যোগে পরিণত করতে পারি।

২. বাংলাদেশে বন্যা ঃ কারণানুসন্ধান

বাংলাদেশ নদী অববাহিকা অঞ্চলে অবস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। এর দক্ষিণে রয়েছে বিশাল বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর ভূমি কম-বেশী ঢালু হয়ে নেমে গেছে। বিশাল এবং সুদীর্ঘ তিনটি নদী ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং মেঘনা বাংলাদেশের বাইরে উৎপন্ন হলেও তাদের পানি নিস্কাশনের চূড়ান্ত এবং সর্বশেষ আঁধার হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর। তদুপরী হিমালয়ের দক্ষিণভাগ এবং মধ্য ভারতের মাঝখানে যে এপাশ-ওপাশ পূর্ব-পশ্চিম সুবিস্তৃত নিম্নভূমি রয়েছে তা ঢালু হয়ে বাংলাদেশের দিকেই নেমে গিয়েছে। ফলে হিমালয়ের দক্ষিণভাগে উৎপন্ন এই নদ-নদীগুলি সরাসরি মধ্যভারত পার হয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে না গিয়ে ধাবিত হয়েছে আড়া-আড়িভাবে বাংলাদেশের দিকে এবং বাংলাদেশ হয়ে পতিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। ভূ-বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশের মতো এত ছোট অঞ্চলে এতগুলি নদীর একত্র সমাহারের নিদর্শন পৃথিবীতে খুবই বিরল ব্যাপার। এক হিসাবে জানা যায় যে নদ-নদী-শাখা নদী মিলিয়ে বাংলাদেশে এদের সংখ্যা প্রায় ২৫০টি। অবশ্য এর মধ্যে ৫৪ টিরই উৎস হচ্ছে ভারতে। বাংলাদেশের প্রধান ৩টি নদী পদ্মা, যমুনা এবং মেঘনা—

সকলেরই উৎপত্তিস্থল ভারত। ভারতে এই নদীগুলির আদি নাম হচ্ছে গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং বরাক নদী। এই তিন নদীর পানি প্রবাহই হচ্ছে বাংলাদেশের মোট উপরিস্থ পানি প্রবাহর সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ষাট-পয়ষট্টি শতাংশ। সুতরাং এই তিন নদীর পানি প্রবাহের পরিমাণের বাড়া-কমার উপরেই বাংলাদেশের বন্যা প্রধানতঃ নির্ভরশীল। এক সমীক্ষায় দেখা যায় গত ৩৪ বছরে যে ২৭ বার বন্যা হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ৩ বার বন্যার প্রাথমিক কারণ ছিল অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, বাদ-বাকি ২৪ বারই বন্যার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ছিল বাইরের নদীগুলি দ্বারা বাহিত পানির ঢল।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এসব নদীতে পানি প্রবাহ বাড়ে কেন? কখন এবং কিভাবে তা বৃদ্ধি পায়? এসব বিষয়ের বিস্তৃত ও জটিল টেকনিক্যাল উত্তর রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে সহজ ভাষায় শুধু মোদ্দা কথাটি এখানে তুলে ধরবো।

প্রকৃতিতে রয়েছে একটি পর্যায়ক্রমিক পানি চক্র। এই পানি চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পানি অনবরত এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হচ্ছে। যেমনঃ বাতাসে পানির বাষ্পরূপ ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ, পরে বৃষ্টিতে পরিণত হচ্ছে, সেই বৃষ্টির পানি শীতল স্থানগুলিতে যেমন হিমালয়ের শিখরে তুষার রূপে জমাট বাঁধছে, পরে গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত উত্তাপে ঐ তুষার গলে গিয়ে নতুন পানি প্রবাহ সৃষ্টি করছে যার একটি অংশ ভূগর্ভে জমা হচ্ছে এবং অপরাংশ নদ-নদী খাল-বিল ইত্যাদি স্থানে ভূউপরিস্থ পানি হিসাবে জমা হচ্ছে। আবার ভূগর্ভস্থ পানি বৃক্ষ কর্তৃক শোষিত হচ্ছে এবং প্রস্বেদনের মাধ্যমে অংশবিশেষ পুনরায় বাস্পরূপ ধারণ করছে। অনুরূপভাবে ভূগর্ভস্থ ও ভূউপরিস্থ উভয় প্রকার পানিই সূর্যের উত্তাপে এবং মানুষের নানা রকম ব্যবহারের পর্যায় অতিক্রম করে পুনশ্চ বাষ্পরূপ ধারণ করছে। এই সমগ্র পানি-চক্রের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বিদ্যমান। ১. Evapotranspiration অথাৎ বাষ্পীভবন এবং প্রস্বেদনের যে প্রক্রিয়ায় পানি ভূমি থেকে মুক্ত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে সেটি এবং ২. Precipitation অর্থাৎ বৃষ্টি এবং তুষারপাতের মাধ্যমে যেভাবে পানি পুনরায় ভূমিতে ফিরে আসছে সেই প্রক্রিয়া।

এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার ঐক্য দ্বারাই পানি চক্র গঠিত।

কিন্তু এদের মধ্যে ভারসাম্য সকল অঞ্চলে সকল সময়ে সুষম হয় না। পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে দেখা যায় সারা বছরই Evapotranspiration এর হার Precipitation এর হারের চেয়ে বেশী থাকে। এসব দেশ/অঞ্চল তখন অনিবার্যভাবে মরু অঞ্চলে পরিণত হয়। আবার বিপরীতক্রমে যেসব অঞ্চলে সারা বছর Precipitation এর হার Evapotranspiration এর হারের চেয়ে বেশী হয় সেসব অঞ্চলে আবহাওয়া সারা বছরই আর্দ্র থাকে এবং উদ্বৃত্ত পানি ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারলে নদী-নালা খাল-বিল উপচে পড়ে তা বন্যার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশে অবশ্য আমরা মৌসুম ভেদে পানি চক্রের দুটি অভি-শাপেরই যুগপৎ উপস্থিতি লক্ষ্য করে থাকি। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাত ও হিমালয়ের বরফ গলা পানির আধিক্য সৃষ্টি করে বন্যা এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে বাষ্পীভবন প্রস্বেদনের অতিরিক্ত হার সৃষ্টি করে খরা। এইভাবে প্রাকৃতিক কারণে কিছুটা খরা এবং কিছু পরিমাণ বন্যা প্রতি বছরই আমাদের দেশে সংঘটিত হচ্ছে। তবে অতীতে খুব কম সময়ই তা অপরিমিত বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভুত ছিল। কিন্তু ইদানিং প্রায়ই তা নিয়ন্ত্রণাতীত হয়ে বিপুল ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই প্রসংগে নীচের ছকে আমরা আমাদের প্রধান প্রধান নদীগুলি সম্পর্কে মূল তথ্যগুলি তুলে ধরছি। ১নং ছকের তথ্যাবলী থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে—

(ক) বাংলাদেশ অনেকগুলি বড় নদীর মুখে অবস্থিত।

(খ) এখানে ছোট জায়গায় অনেকগুলি নদী কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

(গ) নদীগুলির অধিকাংশ এলাকা, উৎস ও যাতায়াত পথ দেশের বাইরে অবস্থিত। সম্মিলিত হিসাবে দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং মেঘনার মোট drainage area হচ্ছে ২৯ লক্ষ ৩০ হাজার বর্গ কিলোমিটার। তার মাত্র ৭.৫ শতাংশ বাংলাদেশে অবস্থিত।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহের কারণে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবছর বাইরের বিস্তৃত এলকার বিশাল পলি প্রবাহ এবং পানি প্রবাহের নিস্কাশন মুখ হচ্ছে এই ক্ষুদ্র বাংলাদেশ। ফলে নদীগুলিতে পানি এবং পলি বাড়লে বন্যার ভয়াবহতা ত্বরিৎ গতিতে বৃদ্ধি পায়।

আবার নদীগুলিতে পানি প্রবাহ বৃদ্ধির পেছনে আমাদের মৌসুমী

ছক—১
বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলির গতিপথ

নদীর নাম	উৎস	বাংলাদেশে প্রবেশ পথ	মোট দৈর্ঘ্য	বাংলাদেশে প্রবাহমান অংশের দৈর্ঘ্য (%)	বাংলাদেশে প্রধান প্রধান শাখা/প্রশাখা	সমাপ্তিস্থল
১। গঙ্গা (পর-বর্তীতে পদ্মা)	হিমালয়ের বংশী গ্লেসি-য়ার	শিবগঞ্জ (রাজ-শাহী)	২৬০০ কিঃ মিঃ	২৩০ কিঃ মিঃ (৮.৮৪)	মহানন্দা, গোরাই	প্রথমে নতুন ব্রহ্মপুত্র বা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রাজবাড়ীর কাছে এসে। পরে আরো দক্ষিণে মোহনপুরের কাছে এসে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সাগরে নেমে গেছে,
২। ব্রহ্মপুত্র (পর-বর্তীতে যমুনা)	হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম তিব্বত উপত্যকা	রংপুর	২৮০ কিঃ মিঃ	২৭০ কিঃ মিঃ (৯.৬৪)	ধরলা, দুধকুমার, তিস্তা, দুধসাগর	যমুনা নাম ধারণ করে পদ্মা নামধারী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে রাজবাড়ীতে, তারপর মিলিত ধারাটি মোহনপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলে সাগরে নেমে গেছে।
৩। বরাক (পর-বর্তীতে মেঘনা)	আসামের পাহাড়ী অঞ্চল	উত্তর সিলেট	৮০০ কিঃ মিঃ	৪০০ কিঃ মিঃ (৫০)	সুরমা, কুশিয়ারা মনু খোয়াই, কালনী।	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে ব্রহ্মপুত্রের আরেকটি শাখা মেঘনার সঙ্গে ভৈরবের কাছে মিলিত হয়েছে। মিলিত ধারাটি পুনরায় মোহনপুরে এসে নতুন ব্রহ্মপুত্র/যমুনা এবং পদ্মার সঙ্গে মিলে সাগরে নেমে গেছে।

জলবায়ুর অবদান সবচেয়ে বেশী। প্রতিবছর জুন-অক্টোবর মৌসুমে ভারত মহাসাগর থেকে প্রচুর আর্দ্র বাষ্প ভরপুর বায়ু উত্তরের দিকে ধাবিত হয়। বাংলাদেশ অতিক্রম করে হিমালয়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধীরে ধীরে তা উপরে উঠে যায়---ঘনীভূত হয় এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই বৃষ্টির পানিই আবার হিমালয়ের এসব নদী পথে প্রবাহিত হয়ে আগষ্ট-সেপ্টেম্বর নাগাদ আমাদের দেশে প্রবেশ করে। আবার অন্যদিকে মার্চ মাস থেকে হিমালয়ের বরফ গলতে শুরু করে এবং তা প্রায় অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। অতএব জুন—অক্টোবর এই সময় একই সংগে বৃষ্টির পানি ও বরফগলা পানি যুগপততার হেরফেরের দরুণ বন্যার মাত্রার কম-বেশী হতে পারে।

মেঘনা নদী যেহেতু প্রধানতঃ বৃষ্টির পানির উপর নির্ভরশীল সেহেতু মৌসুমী বৃষ্টির কারণে মেঘনার পানি সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছায়, সাধারণতঃ জুন থেকে অক্টোবরের মধ্যে যে কোন সময়। অপরদিকে মার্চের বরফ গলা পানির প্রবাহে ব্রহ্মপুত্র জুন বা তার আগেই প্রথমে একবার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছায় এবং পরে বৃষ্টিপাতের ফলে আগষ্ট---সেপ্টেম্বরে আরেকবার সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছায়। এদিকে গঙ্গার পানি বৃষ্টিপাত ও বরফগলা উভয়ের প্রভাবে সচরাচর জুন নাগাদ বাড়তে থাকে এবং আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আগষ্ট মাসের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সেপ্টেম্বরের প্রথমার্ধ এই এক মাসের যে কোন সময় গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা তিনটি নদীই সর্বোচ্চ স্তরে পৌছে যেতে পারে। কার্যতঃ ১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৮৭ এবং সর্বশেষ ১৯৮৮তে ঠিক তাই হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। ফলে বন্যার প্রকোপও এসব বছরে ছিল খুবই ভয়ংকর। তাই মার্চ মাসেও যে সব আগাম বন্যা কখনো কখনো হয় তা কখনই আগষ্ট-সেপ্টেম্বর বন্যার মত ভয়াবহ হয় না। তবে যে বছর আগাম বন্যা ও পরবর্তী বন্যা পর পর দুইবার আঘাত হানে সে বছর দেশবাসীর দুঃখের শেষ থাকে না।

জুন-সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের নদীগুলিতে গড়ে মোট পানি প্রবাহ যে জায়গায় থাকে ৫০ লক্ষ কিউসেক সে জায়গায় শুষ্ক মৌসুমে তা কমে গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র আড়াই লক্ষ কিউসেক। একইভাবে

স্থানীয় বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও এই মৌসুমী তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। গত ৩০ বছরের হিসাব থেকে দেখা যায় যে বাংলাদেশে গড় বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৩২০ মিঃ মিঃ (অবশ্য অঞ্চল ভেদেও তারতম্য বিরাট—পশ্চিমাঞ্চলে তা ১১১০ মিঃ মিঃ হলেও উত্তর পূর্বাঞ্চলে তার পরিমাণ হচ্ছে ৫,৬৯০ মিঃ মিঃ)। কিন্তু এই গড় বাৎসরিক বৃষ্টির ৮০ শতাংশই পতিত হয় জুন-সেপ্টেম্বর মৌসুমে (দেখুন ৫, পৃঃ-১৭৫ এবং ১৪, পৃঃ-৭)। বিশিষ্ট বিশেষজ্ঞ বি, এম আব্বাসের মতে আমাদের দেশে জুন-সেপ্টেম্বর মৌসুমে পানি বৃদ্ধির পেছনে বর্ধিত স্থানীয় বৃষ্টির পানি একটি কারণ হলেও তা প্রধান কারণ নয়। প্রধান কারণ হচ্ছে নদীবাহিত পানির ঢল।

কিন্তু এই বাড়তি পানির ঢল বন্যা সৃষ্টি না করে যথানিয়মে প্রবাহিত হতে পারছে না কেন? এইখানে এসে আমরা যদি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করি তা'হলে অনেকগুলো মনুষ্য সৃষ্ট কারণের সন্ধান পাব। প্রথমতঃ প্রতিবছর নদীগুলি গড়ে ২৪১ কোটি টন (মতান্তরে ১৫০ কোটি টন) পলিমাটি বহন করে নিয়ে আসে। বস্তুতঃ বাংলাদেশ প্রথম থেকেই একটি সক্রিয় অববাহিকা অঞ্চল হিসাবে এসব পলিমাটি দ্বারাই গঠিত হয়েছিল। এখনো তাই সাগরের মুখে নতুন নতুন দ্বীপ জাগার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু যেহেতু আমাদের ভূমির উত্তর থেকে দক্ষিণ ঢালের পরিমাণ বেশী নয় (উত্তর পূর্বাঞ্চলের ব্যতিক্রম বাদ দিলে) এবং বাংলাদেশ গড়ে সমুদ্রতটের (Sealevel) তুলনায় মাত্র ৪ মিটার উঁচুতে অবস্থিত সেহেতু এখানকার নদীগুলোর পলি বহন ক্ষমতা কম। ফলে প্রতিবছর নদীবক্ষে পলি জমে নদীর গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু সুদুর অতীতে পুকুর খনন, দীঘি খনন, খাল খনন, সেতু নির্মাণ ইত্যাদি যেসব প্রথা চালু ছিল, বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং জমির দুষ্প্রাপ্যতার কারণে সেসব প্রথা ধ্বংস হয়ে গেছে। তদুপরি রাজা ও জমিদারদের নয়া উত্তরসুরীরা জলপথের চেয়ে স্থল পথকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক ধারা অনুসরণ করে তাই নির্বিচারে যত্র-তত্র গড়ে তোলা হয়েছে রাস্তা-ঘাট রেললাইন। ঔপনেবিশিক শাসকরা অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন দ্রুত কাঁচামাল আহরণের উপর। তাই ভারত-বর্ষের বাস্তব প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধাসমূহ উপেক্ষা করে স্বীয় প্রয়োজনে

তারা রেলপথের উন্নতিসাধন করেছিলেন। তখন আধুনিকতার প্রসারে যদিও তা "অসচেতন বাহক" হিসাবে কাজ করেছে কিন্তু একই সঙ্গে বাংলার ট্র্যাডিশনাল যাতায়াত ব্যবস্থাকে তা কৃত্রিমভাবে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছিল। এই বিষয়ে স্বীকৃতি মেলে তৎকালীন পানি বিশেষজ্ঞ (O. C. LEES) ও. সি. লীস এর স্বীকারোক্তিতে। ১৯০৬ সালে প্রদত্ত এক লেক্‌চারে লীস বলেন, "বর্তমানে ভারতে, যেমনটি আমি আগে আপনাদেরকে জানিয়েছি, বিগত ৪০ বছরে জলপথের উন্নয়নের জন্য মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল অনূর্ধ্ব ৫০ লাখ পাউণ্ড। পক্ষান্তরে একই সময়ে রেলপথের উন্নয়নের জন্য মোট ব্যয় ছিল ২০ কোটি পাউণ্ডের উর্ধ্বে! এই সমস্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে এই দেশে নৌ-বাণিজ্য পথের গুরুত্ব পুরোপুরি স্বীকৃতি পায় নি। অথচ কেবলমাত্র বাংলাতেই নৌ পথের উন্নয়ন ও বিকাশের এত সুবিধা রয়েছে যা দুনিয়ায় আর কোথাও নাই।" (দেখুন ঃ O. C. Lees *Waterways In Bengal, Their Iconomic Value And The Methods For Their Improvement ঃ Six Lectures Delivered During March, 1906,* Calcutta, The Bengal Secretariat Book Depot, 1906, p=9.)। ক্রমবর্ধমান মানুষ সমস্ত জায়গা ভরাট করে সেখানে তৈরী করেছে নতুন নতুন বাড়ি-ঘর, ইত্যাদি। সুতরাং দীর্ঘদিনের এসব সঞ্চিত ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে কি নদী পথে বা কি অন্য কোন পথে বাড়তি পানির নিষ্কাশন বা সঞ্চয়নের কোন সুযোগ আর অবশিষ্ট নেই। ফলে প্রকৃতির উপর নির্বিচার হস্তক্ষেপের প্রতিশোধ আজ প্রকৃতি নিচ্ছে। যে বন্যা ছিল স্বাভাবিক, সে বন্যা হয়ে পড়েছে নিষ্ঠুর, অস্বাভাবিক, নিয়ন্ত্রণাতীত।

এই ধরনের আরেকটি মনুষ্য সৃষ্ট কারণের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য জায়গায় জায়গায় মাটি কেটে নদীর পাড় উঁচু করে বাঁধ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ছোট-খাট নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এগুলি সাময়িকভাবে ভাল ফল দিলেও এগুলি দীর্ঘস্থায়ী নয়। আর বড় নদীর ক্ষেত্রে এসব বাঁধ যদি একবার ভেঙ্গে যায় তা'হলে যে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা '৮৮-র বন্যার ক্ষেত্রেই আমরা সবচেয়ে ভালভাবে প্রত্যক্ষ করছি। প্রায়ই এসব মনুষ্য সৃষ্ট বাঁধ এক পাশের বন্যা ঠেকাতে গিয়ে অন্য পাশে বন্যার

জন্ম দেয়। বাঁধের ভরসায় বহু লোক যখন বাঁধের এপারে ঘর-বাড়ী সম্পদ গড়ে তোলে তখনই কোন এক মৌসুমে হয়তো দেখা যায় যে নদীর অস্বাভাবিক বন্যার তোড়ে বাঁধ ভেঙ্গে গেছে তখন ক্ষতির পরিমাণ খুবই বিশাল হয়। বাঁধের ভিতরের নিম্নাঞ্চলে অনেক সময় বৃষ্টির পানি ও অন্যান্য পানি জমে গিয়ে আংশিক বন্যা ও জলবদ্ধতার সৃষ্টিও হয়ে থাকে। সুতরাং সামগ্রীক বিচারে দেখা যায় অপরিকল্পিত ভাবে এবং সুরক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া বাঁধ নির্মাণ করে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে বন্যার প্রকোপ উল্টো আরো বৃদ্ধি পায়।

আরেকটি বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে মানুষ কর্তৃক নির্বিচার বৃক্ষ নিধনের উৎসব। বন কেটে উজাড় করে ফেলছে মানুষ। ফলে একদিকে যেমন Evapotranspiration এর হার কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি মাটিকে পাহাড়ের গায়ে আটকে রাখা যাচ্ছে না। পানির সঙ্গে তা নেমে আসছে নীচে এবং বিঘ্নিত পানি প্রবাহ তখন বন্যা সৃষ্টি করছে।

সাম্প্রতিক বন্যার ভয়াবহতা লক্ষ্য করে কোন কোন বিশেষজ্ঞ ভূমিকম্পের ফলে বর্ধিত হারে বরফ গলা এবং ভূমি ধ্বংসের বিষয়টিকে কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। বায়ুতে ওজন স্তরের মাত্রা কমে যাওয়ায় যেসব নতুন পরিবেশ প্রতিবেশগত ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হচ্ছে— বিশেষতঃ নির্বনায়নের মাধ্যমে তার কথাও কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। তবে এসব কারণ প্রত্যক্ষ কারণ নয় বলে এগুলিকে আমরা ততখানি গুরুত্ব না দিলেও পারি।

এ ছাড়া আরো একটি প্রাকৃতিক কারণের কথা অনেকেই বলেন। তা হচ্ছে সমুদ্রের নিয়মিত জোয়ার। বিশেষতঃ ভরা মৌসুমে নদীর পানিগুলি যখন কানায় কানায় পূর্ণ থাকে তখন জোয়ারের উল্টো ধাক্কার (Back tide) কারণে দক্ষিণাঞ্চলের কোন কোন এলাকায় বন্যা ও লবণাক্ততা সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য খরা মৌসুমেও সমুদ্রের পানি এসব অঞ্চলে কখনো কখনো কোথাও কোথাও প্রবেশ করে লবণাক্ততার (Salinity) সমস্যা সৃষ্টি করে থাকে। এ ছাড়া ক্ষণ-কালীন সামুদ্রিক ঝড়, সাইক্লোন বা জলোচ্ছ্বাসও বন্যা সৃষ্টি করতে পারে। তবে এ ধরনের বন্যা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া হয় খুবই মারাত্মক।

কারণানুসন্ধানের এই সংক্ষিপ্ত প্রচেষ্টার পর এই পর্যায়ে আমরা এখন সিদ্ধান্তে যেতে পারি। আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এদেশে মৌসুমী বন্যার পিছনে প্রাকৃতিক কারণই প্রধান কারণ। তবে মনুষ্য সৃষ্ট কারণগুলি এর মাত্রাকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে।

বাংলাদেশে বন্যার প্রকারভেদ ও মাত্রা

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই কোন না কোন ধরনের বন্যা হয়ে থাকে। এমনকি উঁচু পাহাড়ী এলাকাতেও আকস্মিক পানির ঢল ক্ষণস্থায়ীভাবে বন্যা সৃষ্টি করে থাকে। সারা দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যাসমূহকে মোট ৪টি প্রকরণে বিভক্ত করা যায়। এই প্রকরণভেদ গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে বন্যার প্রকরণ (Type) অনুযায়ী সমাধানের আশু পদক্ষেপও ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের হতে পারে। এখানে কোন একদেশদর্শী সমাধান সম্ভব নয়। তাই এক্ষেত্রে আশু পদক্ষেপ সর্বদাই আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য এবং বন্যার প্রকরণ উপলব্ধি করে সৃজনশীলভাবে খুঁজে বার করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে সাধারণভাবে যে চার প্রকার বন্যা দেখা যায় সেগুলি নিম্নরূপ ঃ—

ক. 'ফ্ল্যাশ ফ্লাড' বা আকস্মিক বন্যা

এ রকম বন্যা খুব অল্প সময়ের জন্য স্থায়ী হয়। অত্যন্ত দ্রুত বন্যার পানি নেমে আসে এবং মাত্র কয়েকদিন পরেই তা আবার নেমে যায়। এ ধরনের বন্যা স্বল্পস্থায়ী হলেও এর ক্ষতির তীব্রতা তুলনামূলকভাবে বেশী। নদীর পানি অল্প সময়ের ব্যবধানে হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল গতিবেগে নিম্নাঞ্চলে প্রবেশ করে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ ধরনের বন্যায় ঘর-বাড়ী মানুষজন ইত্যাদি সম্পদ শুধু ডুবে যায় না, ভেসে যায়। ভোগাই, কংস, মুহুরি, ফেনী, শংগু, বগখালী; খোয়াই, হালদা, মনু, সোমেশ্বরী ইত্যাদির দুই পাড়ে অবস্থিত অঞ্চলে অর্থাৎ ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী এবং চিটাগাং-এর কোথাও কোথাও এ ধরনের বন্যা হতে দেখা যায়।

খ. বৃষ্টি বিধৌত বন্যা

বাংলাদেশের যে কোন অঞ্চলে এ ধরনের বন্যা হতে পারে। যদি কোন কারণে স্থানীয় বৃষ্টিপাত একনাগাড়ে বহুদিন পর্যন্ত হতে থাকে তাহলে যেসব নীচু এলাকায় সুষ্ঠু পানি নিস্কাশন প্রনালী নেই সেসব এলাকায় বৃষ্টি জমে বন্যা হতে পারে।

গ. মৌসুমী বন্যা

মূল মূল নদীর পানি প্রবাহ বিশেষ মৌসুমে বিপদসীমা অতিক্রম করে প্রবাহিত হতে থাকে এবং তা প্রায়ই দশ থেকে কুড়ি দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। তখন নদীর পানি উপচে পড়ে যে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী বিস্তৃত ও কষ্টদায়ক বন্যার সৃষ্টি হয় তাকেই মৌসুমী বন্যা বলা হয়।

ঘ. সমুদ্রোপকুলে বন্যা

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষতঃ সমুদ্রোপকুলে এ ধরনের বন্যা হয়ে থাকে। সমুদ্রে নিয়মিতভাবে ১২ ঘন্টা পর পর জোয়ার আসে। যদি কখনো এই স্বাভাবিক জোয়ারের সঙ্গে ঝড়ো হাওয়ার প্রভাব যুক্ত হয় তাহলে ঝড় এবং জোয়ার মিলে জলোচ্ছাসের সৃষ্টি হতে পারে। ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৮৫ এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের সুমুদ্রোপকূলে এ ধরণের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা মাত্রার জলোচ্ছাসজনিত বন্যা হতে দেখা গেছে। (এসব বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ১১ এবং ১৫) তবে মনে রাখা প্রয়োজন যে বাংলাদেশে প্রায় বৎসরই চার প্রকার বন্যা একই সঙ্গে সংঘটিত হয়ে থাকে। ১৯৮৭ সনের বন্যা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৮৭ সনে প্রথমে রংপুর অঞ্চলে অত্যাধিক বর্ষণের কারণে বন্যা হয়েছিল। তার কিছুদিন পরেই আগষ্ট মাসে উত্তরের পাহাড়ী নদীগুলিতে আকস্মিক বন্যার সৃষ্টি হোল। একই সঙ্গে আগষ্ট মাসের শেষার্ধ জুড়ে যুক্ত হোল মৌসুমী বন্যার সমস্যা। ২৭ আগষ্ট মোহাররমের চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে বৃষ্টিপাত আরো বৃদ্ধি পেলে বন্যার প্রকোপও আরো বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রে ঝোড়োহাওয়া এবং জোয়ারের কারণে পানি নিষ্কাশন শ্লথ হয়ে যায়।

ফলে পুনরায় নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, ঢাকায় বন্যা তীব্রতর হয়। (দেখুন ১৫)

এই বিভিন্ন প্রকার বন্যার পানি বাংলাদেশের কতটুকু অঞ্চলকে প্লাবিত করতে পারে সে বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ১৯৫৪-৭৮ পর্যন্ত বন্যার ইতিহাসে ঘেটে বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে কখনো না কখনো কোন না কোনভাবে বন্যা হয়েছে সেগুলির তৈরী করে হিসাব করে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে সম্ভাব্য বন্যা এলাকার মোট পরিমাণ ৮২ হাজার ৮৮ বর্গ কিঃ মিঃ। এই হিসাবানুযায়ী বলা যায় যে বংলাদেশের মোট এলাকার ৫৮ শতাংশই হচ্ছে সম্ভাব্য বন্যা এলাকা। অবশ্য স্মর্তব্য যে এই মোট সম্ভাব্য বন্যা এলাকার সর্বত্র বন্যার গভীরতা ও তীব্রতা সমান নয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দলিলে বন্যার পানির গভীরতার মাত্রা অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জমিকে বিভক্ত করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ২ নং ছকে সেই তথ্য তুলে ধরা হোল ঃ

ছক—২

বন্যার গভীরতা	জমির আয়তন (মিঃ একর)	মোট জমির শতাংশ
১ ফুটের কম	৯˙২৫০	৩৬˙০৮
১— ৩ ফুট	৮˙৯৫৭	৩৪˙৯৪
৩ — ৬ ফুট	৪˙১৯৪	১৬˙৩৭
৬ — ১০ ফুট	২˙৬৪৫	১০˙৩৩
১০— ফুটের উপরে	˙৫৮৩	২˙২৮
মোট	২৫˙৬৩১	১০০

উৎস ঃ (৫, পৃঃ ; ৭?)

উপরোক্ত ছক থেকে দেখা যায় যে যদি আমরা ৩ ফুটের উর্ধে পানি থাকে এরকম এলাকাগুলোকে হিসাবের মধ্যে নেই তাহলে আমাদের সম্ভাব্য বন্যা এলাকার পরিমাণ দাঁড়াবে মাত্র ৭˙৪২ মিঃ একর অর্থাৎ বাংলাদেশের এলাকার মাত্র ২৯ শতাংশ। কিন্তু আবার ১ ফুটের চেয়ে গভীর এলাকাগুলোকেও যদি আমরা হিসাবের মধ্যে

নেই তাহলে বাংলাদেশের সম্ভাব্য বন্যা এলাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬·৩৭ মিঃ একর এবং এটি হচ্ছে মোট এলাকার প্রায় ৬৪ শতাংশের সমান। এই দ্বিতীয় হিসাবটি আবার অবশ্য আমাদের প্রথম হিসাবটির (৫৮ শতাংশ) চেয়ে ৬ শতাংশ বেশী। যাই হোক এ কথা নিরাপদে বলা যায় যে বাংলাদেশের অন্ততঃ অর্ধেক এলাকা হচ্ছে সম্ভাব্য বন্যা এলাকা।

৪। বন্যা সমস্যা ঃ স্থায়ী সমাধানমুখী পদক্ষেপ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রশ্ন

বন্যা সমস্যার উপরোক্ত বিশ্লেষণে যেসব মৌলিক কারণ ধরা পড়েছে সেগুলি যতদিন দূরীভূত বা নিয়ন্ত্রিত না হবে ততদিন বন্যা সমস্যার কোন স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ বা সমাধান সম্ভব নয়। আমাদের বিশ্লেষণে আমরা দেখিয়েছি যে বন্যার পিছনে দুই প্রকার কারণ কাজ করেছে—মৌলিক বা মুখ্য কারণগুলি প্রাকৃতিক (যেমন অত্যাধিক বৃষ্টিপাত, বরফ গলা পানি, পাহাড়ী ঢল ইত্যাদি) সেহেতু এগুলি একেবারে দ্রবীভূত করা অসম্ভব। তবে এই কারণগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে স্থায়ীভাবে সংক্ষিপ্ত বা লাঘব করা সম্ভব। এক্ষেত্রে আমাদের দেশে বন্যা-খরার যুগপততাকে একই সঙ্গে সমাধানের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সম্ভব একটি পদক্ষেপ হচ্ছে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার মাধ্যমে বৃহৎ নদ-নদীর জন্য সমন্বিত পানি নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করা। উজান এলাকায় জলাধার নির্মাণ করে বাঁধের সাহায্যে বর্ষাকালে এসব নদীর উদ্বৃত্ত পানি সংরক্ষণ করে ধরে রাখা সম্ভব এবং গ্রীষ্মকালে তা উপযুক্ত মাত্রায় ছেড়ে দিয়ে একই সঙ্গে খরা নিবারণও সম্ভব। অবশ্য এ ব্যাপারে সকল বিশেষজ্ঞরা এখনো একমত হন নি। শুধু টেকনিকাল সম্ভাব্যতা নয়। এই প্রস্তাবটির সঙ্গে কতিপয় ভূরাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক ইস্যুও জড়িত রয়েছে, কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপের জন্য একা বাংলাদেশের প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। নদী অববাহিকায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের সহযোগীতা ব্যতীত এই প্রকল্প সাফল্যের সঙ্গে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু এই প্রকল্প বাস্তবায়ন অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাই এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রযুক্তিগত সাহায্যও অপরিহার্য বটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের বন্যার মূল কারণকে দূর করার জন্য এমন একটি বিশেষ ধরনের উদ্যোগ

প্রয়োজন যা মূলতঃ উপমহাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থার সামগ্রীক অগ্রগতি এবং সেই অগ্রগতির দীর্ঘস্থায়ী স্থিতিশীলতার উপর নির্ভরশীল। তদুপরি প্রয়োজন হবে দাতা দেশগুলির অনুকূল মনোভাব। এই উপমহাদেশে আঞ্চলিক সহযোগিতার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই যে যদিও সম্প্রতি 'সার্ক' গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে এক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সাধিত হয়েছে কিন্তু এখনো এক্ষেত্রে ভারতকে কেন্দ্র করে ছোট দেশগুলির সন্দেহ ও দ্বিধা কমে নি। অবশ্য এর কিছুটা বাস্তব ভিত্তিও রয়েছে। পুরোটাই আমেরিকান অস্থিতিশীলিকরণ কৌশল বা ঈর্ষা বা সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসূত নয়। এক হিসাবে দেখা যায় যে সার্কভুক্ত অঞ্চলগুলির ৭৬ শতাংশ জনসংখ্যা, রপ্তানী আয়ের ৬২ শতাংশ, আমদানী বাজারের ৫৯ শতাংশ, বৈদেশিক রিজার্ভের ৪১ শতাংশ, ম্যানুফেকচার খাতে উৎপাদিত দ্রব্যের ৬৮ শতাংশ এবং ঐ একই খাতে সংযোজিত মূল্যের প্রায় ৭৯ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করে একা ভারত। এসব সূচকগুলি ভারতের অত্যাধিক অর্থনৈতিক ক্ষমতারই জ্বাজ্বল্যমান প্রমাণ (দেখুন ১৫)। সুতরাং ভারত ছাড়া এ অঞ্চলের অন্য দেশগুলি বাস্তবেই দুর্বল বলে তাদের মধ্যে রয়েছে নানারকম আশংকা। এই কারণে দেখা যায় ব্যবসা-বাণিজ্য যোগাযোগ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে লেন-দেনের তুলনামূলক সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ছোট দেশগুলি (বিশেষতঃ পাকিস্তান) পশ্চিম এশিয়া বা ইউরোপ আমেরিকার সঙ্গেই অধিক সহযোগিতার প্রতি ঝুঁকে রয়েছে। বাংলাদেশের মনোভাব অতটা কট্টর না হলেও ১৯৭৫ পরবর্তীতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে বিশেষতঃ ভারতের সঙ্গে একই অবনতিমূলক প্রবনতাই লক্ষ্য করা যায়। অতি সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো শীতলাকার ধারণ করেছে। তবে দুঃখজনক যেটা সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক কারণে এই সম্পর্কের অবনতির ধারাকে আরো ফেনিয়ে তোলা হচ্ছে। সস্তা সাম্প্রদায়িক সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে' অগণতান্ত্রিক সরকার তার নিজ দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছেন। তবে বাস্তব ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিই এমন যে ভারতের সঙ্গে সরাসরি শত্রুতা করে বাংলাদেশের পক্ষে সমস্যার সমাধান আরো কঠিন। তদুপরি বর্তমানে ব্যক্তিগত খাতে পুঁজিবাদী ধারা অনুসরণের ফলে দুই দেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বাভাবিক মুনাফাবৃত্তির কারণেই ধীরে ধীরে গড়ে

উঠছে নানা ধরনের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পর্ক তাই যতই শীতল হোক না কেন দুই দেশের মধ্যে গোপন পণ্য প্রবাহের স্রোত যথেষ্ট উষ্ণ বটে। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এই অপরিকল্পিত লেন-দেনে বরং বাংলাদেশের ক্ষতিই হচ্ছে বেশী। কারণ এই অপরিকল্পিত লেন-দেন অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাজারের নিয়মাধীন যাতে অধিকতর শক্তিশালী অংশীদার হিসাবে ভারতের লভ্যাংশই থাকছে বেশী। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে এবং বন্যা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে প্রথমেই প্রয়োজন শাসক শ্রেণীর মনোভাবের পরিবর্তন। আমরা যদি জাতির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে বহুমুখী সহযোগীতার জন্য বাজার বা ব্যক্তিগত খাতের ভিত্তিতে নয় পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হই তাহলেই আমরা লাভবান হব। 'সার্ক'-এর মূল প্রেরণাকে যদি আমরা সাম্রাজ্য-বাদী দেশগুলির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক স্বনির্ভরতা অর্জনের সংগ্রামে পরি-কল্পিতভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলেই প্রকৃত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে। আর যদি তা পরিণত হয় ভারতের বিরুদ্ধে ছোট দেশগুলির নিরন্তর খুনসুটিতে তাহলে আমরা কেউই লাভবান হব না। তবে এক্ষেত্রে ভারতকেও তার দৃষ্টিভঙ্গী পুনর্বিবেচনা করতে হবে। ভারত যদি ভাবে যে বাজারের শক্তির উপর নির্ভর করে সে উদাসীনভাবে বসে থাকবে, তাহলে আঞ্চলিক সহযোগীতা সম্ভব নয়। ভারতকে এই মনোভাব পরিত্যাগ করে কিছুটা উদারতা ও কিছুটা Statemanship দেখালে সামগ্রিক বিচারে ভারতের নিজের এবং সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ারই অগ্রগতি ত্বরান্বিত হবে।

এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক রেহমান সোবহান সঠিকভাবেই বলেছেন, "চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার সবগুলি দেশই বর্তমানে সংকীর্ণ এলিটচক্র দ্বারা শাসিত হচ্ছে এবং তারা সকলেই নিজ নিজ দেশের জনগণকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখছেন। জনগণকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে উন্নয়নের সুফল ভোগ থেকে। বুর্জোয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে এই এলিটদের স্বার্থ যতদিন দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবে ততদিন এসব দেশে অবাধ বাজারের খেলাকে নিয়ন্ত্রণ করা খুবই দুঃসাধ্য হবে। বরঞ্চ সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার সর্বত্র দেখা যাচ্ছে এমন সব নীতি গৃহীত হতে যা কিনা এই বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত শক্তিসমূহকেই আরো উৎসাহিত করবে।

ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় জনগণের মধ্যে প্রকৃত সহযোগিতা, পরস্পরের কথা বিবেচনা করে স্বার্থ ত্যাগ এবং সেইভাবে দুর্বলতর দেশগুলির ক্ষমতার বিকাশ আরো ত্বরান্বিত করা এই সব সম্ভাবনাগুলি ক্রমশঃই আরো সুদূরপরাহত হয়ে যাচ্ছে। (৩০)

সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে বর্তমান বিশেষ ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশু কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। যদিও সেই জন্য এখন থেকেই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন জনগণের প্রকৃত সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, দুই দেশের জনগণের মধ্যে মতবিনিময় এবং জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রসারের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে অর্থসংস্থানের এই বিষয়টিও আজ জরুরী হয়ে পড়েছে। এই উভয় বিধ শর্তপূরণ অবশ্যই সময় সাপেক্ষ। কিন্তু এছাড়া এদেশের বন্যা ও খরা সমস্যার যুগপৎ স্থায়ী সমাধানের অন্য কোন বিকল্প রাস্তা নেই। তবে প্রশ্ন থেকে যায়---যতদিন এই স্থায়ী সমাধান অর্জিত না হচ্ছে ততদিন আমরা কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবো? বন্যাকে মেনে নিয়েও তার ক্ষয়-ক্ষতিকে কমিয়ে আনার জন্য কোন ধরনের আভ্যন্তরীণ অস্থায়ী পদক্ষেপ কি সম্ভব নয়? আসুন পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেদিকে দৃষ্টিপাত করি।

অস্থায়ী পদক্ষেপসমূহ

বন্যা সমস্যার পরিপূর্ণ সমাধান নয়, তবে তার ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার জন্য অনেকগুলি বন্যা নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব। এসব পদক্ষেপ অবশ্য অঞ্চলভেদে, বন্যার প্রকরণভেদে একেক রকম হতে বাধ্য। আমরা ধারাবাহিকভাবে এগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে উল্লেখ করছি—

(ক) পানির স্বাভাবিক প্রবাহকে বিস্তৃত করে ছড়িয়ে দেয়া

যেসব জায়গায় বন্যার পানি ১ থেকে ৩ ফুটের মধ্যে অবস্থান করে সেসব জায়গায় ঘর-বাড়ি বসতি স্থাপন না করে সেখানে প্রতিবছর বন্যার স্বাভাবিক প্রবাহকে প্রবাহিত করার সুযোগ করে দিতে হবে। এই ধরনের স্বল্প বন্যা প্লাবিত এলাকায় বর্ষা মৌসুমে

গভীর জলের আমন ধান চাষ করার উদ্যোগ নিতে হবে। পলি সমৃদ্ধ এসব অঞ্চলে গভীর জলের আমনের ফলন স্বল্প বন্যা জনিত অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে দিতে পারে। সম্ভবমত স্হান বিশেষে বিশেষ ধরনের মৎস্য চাষের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তবে এজন্য উপযুক্ত গুণাগুণ সম্পন্ন ধান গাছ এবং মৎস্যের প্রকরণ (Type) গবেষণার মাধ্যমে আবিস্কার করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এই গবেষণার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে এযাবৎ সাম্রাজ্যবাদী প্রভাবের দরুণ আমাদের দেশে যেসব উফশী বীজ চালু হয়েছে তা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের স্হানীয় আবহাওয়া ও ভূমির গুণাগুণের সঙ্গে খাপ খায় না। সুতরাং বামুন variety-র বদলে গভীর জল আমাদের চাষ প্রসারিত করতে গেলে এদেশের কৃষি গবেষণার ধারা বদলে নতুন নতুন বীজ উদ্ভাবনের প্রয়োজনও দেখা দিবে।

(খ) পানি নিষ্কাশনের পথের উন্নয়ন

বর্ষা মৌসুমের বাড়তি পানি যেসব নদী খাল নালা বিল পুকুর শাখা নদী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় সেগুলির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এই ক্ষেত্রে প্রথম করণীয় হচ্ছে হাজা মজা অগভীর অপ্রশস্ত পুরানো পানিপ্রবাহ পথগুলির পুনঃখনন কাজ। দ্বিতীয়তঃ কোথাও কোথাও নতুন খননকর্মের উদ্যোগও নিতে হতে পারে। বেশীর-ভাগ ক্ষেত্রেই স্হানীয় প্রযুক্তি ও উদ্বৃত্ত জনশক্তি ব্যবহার করেই এই কাজগুলি করা সম্ভব। এই দিকে থেকে এই প্রকল্পগুলির রয়েছে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় সম্পদ অংশ। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে যত্র-তত্র এসব উদ্যোগ নিলে হিতে-বিপরীত হতে পারে। এর জন্য চাই একটি সারা দেশব্যাপী সমন্বিত 'পানি প্রবাহ মহাপরিকল্পনা'! ঐ মহা-পরিকল্পনায় শুধু বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যই সংযুক্ত থাকবে না, আরো সংযুক্ত থাকবে খরা প্রতিরোধের জন্য যুগপৎ জলসেচের ব্যবস্থা। বর্ষার অতিরিক্ত পানিকে এইভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে প্রবাহিত করে দেয়া হবে এবং গ্রীষ্মকালে সেই সঞ্চিত পানি দিয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা-গুলিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে বিশেষতঃ নতুন খননকার্যের এলাকাগুলিতে যে প্রাথমিক ভূমি ক্ষয় হবে তার ক্ষতি-পূরণের দায়িত্ব যেমন একদিকে রাষ্ট্রকে নিতে হবে, তেমনি অন্যদিকে

নতুন জলসেচের ফলে যেসব চাষী পরিবার উপকৃত হবেন তাদের কাছ থেকে প্রগতিশীল হারে কর আদায় করে সরকার তার প্রয়োজনীয় অর্থের সংকুলান ঘটাবেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক প্রস্তুতি ছাড়া এ ধরনের বিশাল উদ্যোগ খুবই মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, সেটাও পাশাপাশি উল্লেখ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে জিয়া সরকার অনুসৃত' 'খাল খনন' কর্মসূচীর কথা এসে যায়। একটি 'আইডিয়া' হিসাবে জেনারেল জিয়ার স্বেচ্ছাশ্রম ভিত্তিক খাল খননের পরিকল্পনায় নানা ইতিবাচক দিক থাকলেও, তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ছিল বিচ্ছিন্ন, ব্যক্তিনির্ভর ও অপরিকল্পিত এবং সেই কারণেই এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে নি। এই প্রসঙ্গে প্রচার সর্বস্ব 'উলশী-যদুনাথপুর' খাল খনন প্রকল্পের নমুনা (Typical) দৃষ্টান্তটির কথা স্মরণযোগ্য।

(গ) আংশিক বন্যা নিয়ন্ত্রণের তৃতীয় সম্ভাব্য পদক্ষেপ হচ্ছে 'নিবিড় বনায়ন' কর্মসূচী

এই দিকটি প্রকৃতই আমাদের দেশে নিদারুণভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছে। এজন্য পরিকল্পিত সরকারী উদ্যোগে বৃক্ষরোপন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি সমাজে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির প্রয়োজন আছে। জনগণকে আজ বুঝানো দরকার যে বন শুধু সবুজ সৌন্দর্যের জন্য নয়, তার আরো অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ উপকারী কাজ রয়েছে যেমন —

১। তা বৃষ্টির পানির প্রায় এক পঞ্চমাংশ থেকে অর্ধেক পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হয়।

২। মাটির বাঁধুনিকে শক্ত করে বৃক্ষ নিজের সঙ্গে আটকে রাখে ফলে প্রবাহিত পানির তোড়ে মাটি চার পাশ থেকে বা পাহাড় অঞ্চল থেকে ধুয়ে ভেসে আসতে পারে না। এর ফলে প্রতিবছর প্রবাহিত পলির পরিমাণ হ্রাস পায়। নদ-নদীর গভীরতা হ্রাস পাওয়ার প্রক্রিয়া শ্লথতর হয়। নদ-নদীর কিনারায় ভাঙনের সম্ভাবনাও তীরবর্তী বৃক্ষরাজি কিছুটা কমিয়ে আনে।

৩। শুষ্ক মৌসুমে সূর্যের তাপের প্রখরতা হ্রাস করে বাষ্পীভবনের হার কিছুটা কমিয়ে আনে। ফলে অপ্রত্যক্ষভাবে বৃষ্টিপাতের মাত্রা হ্রাসে সক্ষম হয়। আবার ভূউপরিস্থ পানির সংরক্ষণ শুষ্ক মৌসুমে সহজতর হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে 'নিবিড় বনায়ন' কর্মসূচীর রয়েছে একাধিক প্রত্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষ উপকার। তবে এই কর্মসূচী যত বিস্তৃতভাবে নেয়া যাবে বিশেষতঃ নদীর উৎস্য মুখ বা নদী যেসব পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে নেমে আসে সেসব দুর্গম স্থানে তা যত ভাল ভাবে নেয়া যাবে ততই এর কার্যকারীতা বেশী হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যে আমাদের দেশে ব্যাপারটি ঘট্ছে ঠিক উল্টা। আইন যাই থাকুক না কেন সাধারণ অসচেতন মানুষ তো বটেই কোন কোন ক্ষেত্রে আইনের রক্ষকগণ স্বয়ং আজকাল বনের ভক্ষকে পরিণত হচ্ছেন।

(ঘ) মূল নদীতে প্রতিবন্ধকতামূলক বাঁধ নির্মাণ (Barrage):

অস্থায়ী পদক্ষেপ হিসাবে এই পদক্ষেপটি বিতর্কিত। মূলতঃ প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ বি. এম আব্বাস হচ্ছেন এই মতের প্রবক্তা। তার মতে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে খরা সমস্যা কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। উপরন্তু উজানে ভারত কর্তৃক নদীর পানির ব্যবহার যত বৃদ্ধি পাবে ততই ভাটির দেশ বাংলাদেশে খরা মৌসুমে পানির প্রবাহ স্বল্প থেকে স্বল্পতর হতে থাকবে এবং ভবিষ্যতে খরা সমস্যাই সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দিবে। তাই বন্যার প্রকোপ লাঘব করার পাশাপাশি বেশী দৃষ্টি দিতে হবে খরা মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করার জন্য। সেজন্য তার মতে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে মূল দুই নদী গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা নির্মাণ করে বাড়তি পানি.ক মৃত শাখা নদীগুলির ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করা। এইভাবে সঠিক স্হানে সঠিক প্রতিবন্ধকতা নির্মাণ করে গোরাই এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব বলে তার বিশ্বাস। ফলে বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ যেমন অংশত লাঘব হবে, তেমনি খরা মৌসুমে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগ এবং উত্তর-পূর্ব ভূভাগ উভয় জায়গাতেই পানির অভাব দূর করা সম্ভব হবে। এই মতটি যেসব কারণে বিতর্কিত তা নীচে বর্ণনা করা হলো—

১। এই পদক্ষেপ যতখানি খরা নিবারণ করবে ততখানি বন্যা নিবারণ করবে কি না তা নিশ্চিত নয়।

২। এই পদক্ষেপ বর্ষামৌসুমে উজানে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা সুস্পষ্ট নয়। বিশেষতঃ উজানে রয়েছে আমাদের প্রতি-

বেশী ভারতবর্ষ যার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পরে আমরা আমাদের স্থায়ী সমাধান প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করার ঝুঁকি নিতে পারি না।

৩। এই 'প্রতিবন্ধকতা' নির্মাণ অত্যন্ত পুঁজিঘন ব্যয় সাধ্য একটি প্রকল্প হবে। ফলে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা আরো পরনির্ভর হয়ে পড়বো। বন্যার অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের জন্য এত খরচের কোন যৌক্তিকতা আছে কি? (অবশ্য জনাব আব্বাস এই ব্যয়-বাহুল্যের কথা নিজেও স্বীকার করেন, তবে তার মতে এই ধরনের 'প্রতিবন্ধকতা' নির্মাণের যেসব বাড়তি উপকার আছে যেমন ঃ-বিস্তৃত জলসেচ, পানি বিদ্যুৎ সৃষ্টি, জলপথের উন্নতি, প্রতিবন্ধকতার উপরে রাস্তা-রেল গাড়ি চলাচলের ব্যবস্থা, গ্যাস ও শক্তি সরবরাহের ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা এই ব্যয়বাহুল্য পুষিয়ে যাবে।

৪। অন্য অনেক বিশেষজ্ঞদের মতে আমাদের মত নদী-অববাহিকা অঞ্চলে যেখানে নদীর গতিবিধি ও পানি প্রবাহের কোন স্থায়িত্ব নেই সেখানে এ ধরনের ব্যয়বহুল অপেক্ষাকৃত স্থায়ীধর্মী পদক্ষেপ না নেয়াই ভাল। আজকে হয়তো প্রকৃতিকে আটকে দেয়া যেতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যতে প্রকৃতি দ্বিগুণ প্রতিহিংসায় আঘাত হেনে বহুগুণ ক্ষতিসাধন করতে পারে।

অবশ্য এ কথা ঠিক যে এ পর্যন্ত বর্ণিত অস্থায়ী সমাধানমুখী পদক্ষেপগুলির কোনটিই প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে শতকরা একশত ভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারে নি।

সেই হিসাবে 'প্রতিবন্ধকতা' পদক্ষেপটিও সাময়িক কিন্তু এর পরেও বাকি আপত্তিগুলি অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। যাই হোক বিষয়টি বিতর্কিত এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়েই নিষ্পত্তি হওয়া উচিৎ। আমরা এখানে শুধু যুক্তি তর্কের কেন্দ্রবিন্দুগুলি উত্থাপন করলাম।

(ঙ) বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বশেষ কিন্তু সর্বাধিক ব্যবহৃত অস্থায়ী পদক্ষেপ হচ্ছে 'বাধ' নির্মাণ

সাধারণতঃ নদীর উপচানো পানি যাতে তীরবর্তী এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে সেহেতু স্থান বিশেষে মাটি-পাথর-সিমেন্ট-জাল ইত্যাদি নানা কিছু ব্যবহার করে এ ধরনের বাঁধ নির্মাণ করা হয়। এ ধরনের বাঁধ নির্মাণ পদক্ষেপের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে এগুলি

অত্যন্ত শ্রমঘন এবং স্হানীয় প্রযুক্তি দ্বারাই এগুলির নির্মাণ সম্ভব। তবে একটি নির্দিষ্ট আয়তন অতিক্রম করে গেলে এই সুবিধা আর থাকে না। তদুপরি সম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এগুলির আরো কতিপয় বিশেষ ত্রুটি চিহ্নিত হয়েছে, যেমন—

১। স্বতঃস্ফূর্তভাবে যত্র-তত্র বাঁধ দেয়ার ফলে প্রায়ই অবশেষে দু-একবছর পর দেখা যায় যে বাঁধের জায়গা (Sfite) ঠিকমত বাছাই করা হয়নি অথবা বাঁধের আদি নক্শাতেই ভুল ছিল। অর্থাৎ পানির সম্ভাব্য উচ্চতা ও শক্তি সম্পর্কে যে ধারণার ভিত্তিতে বাঁধের নক্শা করা হয়েছিল সেটাই ছিল ভুল। এইসব কারিগরি ত্রুটির পুরোটাই যে ব্যক্তিগত গাফিলতির ফল তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নদীর অনিশ্চিত আচরণের দরুন যত ভাল ভাবেই গননা করা হোক না কেন পরিস্হিতি পুনরায় পাল্টে যেতে পারে এবং সঠিক গননাই ভুল গননায় পরিণত হতে পারে।

২। বাঁধ একবার নির্মিত হয়ে গেলে পরে তার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত নিয়মিত তত্ত্বাবধান আবশ্যক। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় সারা বৎসর এক্ষেত্রে কোন নযরই দেয়া হয় না। সুতরাং বন্যার আগে সারা বৎসর ধরে পানির ক্রমাগত মৃদু শোষণ (Seepage) এবং ইঁদুরের আক্রমণের ফলে অনেক জায়গাতেই মাটির বাঁধগুলি ভেতরে ভেতরে প্রায় ধ্বসে পড়ার অবস্থায় পেঁৗছে যায়। তখন আকস্মিক বর্ষার পানির আঘাতে একদিন তা চূড়ান্ত ভাবে ভেঙ্গে পড়ে। যারা এতদিন ধরে ধন-সম্পদ-আশ্রয় গড়ে তুলেছিলেন তারা অপ্রত্যাশিত ক্ষতির সম্মুখীন হন।

৩। অনেক সময় নদীর এক দিকে বাঁধ অন্য পাড়ে বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি করে। বাংলাদেশে অনেক জায়গায় এমনও দেখা গেছে যে একটি অঞ্চলের জনগণ বাঁধকে কেন্দ্র করে দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেছেন। ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের জনতা কোন কোন ক্ষেত্রে জোর করে বাঁধ কেটে দিয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও বাংলাদেশে বিরল নয়।

৪। অনেক সময় বাঁধ দেয়ার ফলে দেখা যায় বন্যা থেকে রক্ষিত অঞ্চলে বা বাঁধের ভিতরের অঞ্চলে বৃষ্টির পানি জমে স্থানে স্থানে নতুন করে 'জলাবদ্ধতা' বা ছোট-খাট মিনি বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থাৎ যেসব বাঁধ নির্মাণের সময় খেয়াল করে ভেতর থেকে পানি

নিষ্কাশনের পথ খোলা রাখা হয়নি অথবা 'স্লুইস গেট' বা 'পাম্পের' ব্যবস্থা করা হয়নি সেসব ক্ষেত্রে বাঁধ বড় বন্যা নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে ছোট বন্যার জন্ম দেয়।

৫। বন্যার পানি আগে যেমন আশে-পাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে প্রবাহিত হয়ে মাটিতে নিয়মিতভাবে পলির সঞ্চার ঘটাতো বাঁধ নির্মানের পরে তা আর সম্ভব হয় না। অর্থাৎ প্রকৃতিতে যে স্বাভাবিক উর্বরায়ন প্রক্রিয়া কাজ করে তা বাঁধ নির্মাণের ফলে ব্যহত হয়। বাংলাদেশে কোন কোন অঞ্চলে চাষীরা জমির উর্বরায়নের স্বার্থে স্বউদ্যোগে বাঁধ কেটে স্বল্প বন্যা সংগঠিত করেছেন—এমন উদাহরণ বিরল নয়।

যাই হোক উল্লিখিত ত্রুটি গুলির সবকটিই অ-এড়ানোযোগ্য Unavoi-dable) ত্রুটি নয়। উপযুক্ত সতর্কতা, পরিকল্পনা এবং সর্বোপরি স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এসব ত্রুটি অনেকাংশেই দূর করা যায়। বস্তুতঃ স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ যে এক্ষেত্রে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা এবারের বন্যায় বিশেষতঃ রাজধানী ঢাকার নিকট ডি, এন, ডি বাঁধ রক্ষার ক্ষেত্রে জনতার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার দ্বারা পুনরিস্ফুট হয়েছে।

অন্যান্য পদক্ষেপ ঃ বস্তুতঃ যেসব অস্থায়ী পদক্ষেপের কথা উপরে উল্লেখ করা হোল তার সবকটিই আমাদের দেশে কম-বেশী চালু আছে। কিন্তু এসবের অভিজ্ঞতালব্ধ সীমাবদ্ধতাগুলি চিহ্নিত হয়েছে তা দূর করে যথাযথ অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগের ও অর্থের উপযুক্ত সংস্থান ঘটিয়ে প্রকৃত কার্যকরী কর্মসূচী এখনো গৃহীত হচ্ছে না। বস্তুতঃ এ ধরনের কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতা ভিত্তি এবং স্বচ্ছ অগ্রাধিকারবোধ বর্তমান সরকারের মাঝে অনুপস্থিত। এমতাবস্থায় হয়তো বন্যার আংশিক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটিও এদেশে অনেকদিন পর্যন্ত ঝুলে থাকবে। তবে নিম্নপক্ষে যেটুকু বর্তমান সরকার এখনই করতে পারেন তা হচ্ছে—একটি সুষ্ঠু সতর্কীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। অন্ততঃ যদি এক সপ্তাহ আগে সম্ভাব্য বন্যাক্রান্ত এলাকাগুলিতে বন্যার আশংকার খবর পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয় এবং বন্যার বিস্তৃতি ও গভীরতা সম্পর্কেও যদি সুনির্দিষ্ট 'সীমারেখা' জনগণকে জানিয়ে দেয়া সম্ভব হয় তা'হলে জনগণ নিজের উদ্যোগেই ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমিয়ে আনতে

সক্ষম হতো। অন্ততঃ আমাদেরকে তখন এমন হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়তে হতো না যখন আমরা 'অদৃষ্টবাদী জাতিতে' (Fatalist') পরিণত হতে বাধ্য হই। এছাড়াও সরকারের পক্ষ থেকে ঘর-বাড়ী-রাস্তাঘাট-স্কুল-হাট-বাজার ইত্যাদি নির্মাণের সময় খেয়াল রাখা উচিৎ যাতে এগুলি অপেক্ষাকৃত উচু জায়গায় নির্মিত হয়। এর ফলে এক দিক থেকে বন্যার ক্ষতির পরিমাণ যেমন কম হবে তেমনি বন্যা হলে মানুষ অন্ততঃ কোথাও না কোথাও আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবেন।

উপরোক্ত সহজতর পদক্ষেপ দু'টি অর্থাৎ সতর্কীকরণ ব্যবস্থা এবং উচু জায়গায় আশ্রয় শিবির নির্মাণের বন্দোবস্ত করা, বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও তা জরুরীভাবে দরকার সাগর তীরবর্তী জনপদগুলির জন্য। তাই সাগর তীরে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণের (Coastal Embankment) পাশাপাশি ঐসব অঞ্চলের জন্য এই পদক্ষেপগুলি জরুরী ভিত্তিতে আরো অগ্রাধিকার দিয়ে বাস্তবায়িত করা উচিৎ।

৫। বন্যা সমস্যার সমাধান : ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা বন্যা সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব সম্ভাব্য আন্তর্জাতিক স্থায়ী সমাধানমুখী পদক্ষেপ এবং আভ্যন্তরীণ অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছি তার প্রায় সব কটিই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে এদেশে অনুশীলিত হয়েছে। কিন্তু বলা বাহুল্য বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে এগুলি এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করেনি।

প্রথমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার কথা ধরা যাক। সুদূর পাকিস্তান আমল থেকেই এই অঞ্চলের বন্যা ও খরা সমস্যাকে কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান যৌথ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল। ১৯৫৪ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে অত্যন্ত ভয়াবহ এক বন্যা হয়েছিল এবং তখন শাসক শ্রেণীর টনক নড়ে যায়। ফলে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই করাচীতে দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা প্রথমবারের মত এক বৈঠকে মিলিত হন। তবে এই বৈঠকে তেমন কোন অগ্রগতি অর্জন হয়নি। শুধু মাত্র 'টেকনিক্যাল' উপাত্ত বিনিময় এবং বন্যার পূর্বাভাস

প্রদানের জন্য পারস্পারিক সহযোগিতার আশ্বাসের মধ্য দিয়েই মিটিং-এর অবসান হয়েছিল। এর পর দীর্ঘদিন ধরে বিশেষতঃ গঙ্গা নদীর পানি বন্টনের 'ইস্যুকে' কেন্দ্র করে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের মধ্যে পত্রালাপ চলতে থাকে। তবে সেই সময় পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার চেয়ে অধিক চিন্তিত ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, ঝিলাম, চেনাব, রাভি, বিয়াস এবং সাতলেজ নদীর পানি বন্টনের সমস্যা নিয়ে। এসব নদীগুলির উৎস ও প্রবাহ পথ অনেকখানি ভারতে থাকায় পাকিস্তান সরকার এসব নদীর পানি বন্টন নিয়ে ভারতের সঙ্গে ১৯৪৮ সাল থেকেই নানা আলোচনা চালিয়ে আসছিলেন। এক্ষেত্রে তখন প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিলেন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব ব্যাংক। বস্তুতঃ শেষাবধি বিশ্ব ব্যাংকের প্রদত্ত প্রস্তাব ও অর্থসংস্হানের ভিত্তিতেই এই জটিল প্রশ্নের মিমাংসা সম্ভব হয়েছিল। ১৯৬০ সালের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল ঐতিহাসিক 'সিন্ধু পানি চুক্তি'। লক্ষণীয় যে ঐ চুক্তিতে শুধু দুই দেশের সরকার প্রধানই স্বাক্ষর করেননি, বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ইলিফও তাতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। এই মিমাংসার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে পাকিস্তান ধীরে ধীরে শুধু সিন্ধু নদের পানি ব্যবহারে মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে আনবে বলে রাজী হয়। অন্যদিকে বাদবাকি নদীগুলির পানি ভারত এককভাবে ব্যবহারের অধিকার অর্জন করে। তবে অন্তবর্তীকালীন দশ বছর পাকিস্তান অন্য নদীগুলির পানিও ব্যবহারের অধিকার বজায় রাখে যদিও ধীরে ধীরে নিদিষ্ট হারে তা কমিয়ে আনার শর্ত সেখানে উপস্হিত ছিল। 'যার যার নদী তার তার ব্যবহার' এই নীতির ভিত্তিতে সমাধান হওয়ায় এই ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, যাঁচাই ইত্যাদির ঝামেলা কমে গিয়েছিল এবং পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে উভয় দেশের সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন (Autonomy) রক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়েও বড় যে কারণে ঐ চুক্তিটি দ্রুত বাস্তবায়িত হয়েছিল তা হচ্ছে উভয় দেশের প্রতি বিশ্ব-ব্যাংকের উদার বৈদেশিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি। দাতা দেশগুলি (এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত ছিল অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, পঃ জার্মানি, নিউজিল্যাণ্ড যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র) এবং বিশ্বব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে এই প্রকল্পের জন্য মোট, ৭৪৭.২০ মিঃ (১৯৬০ সালের দামে) ডলার সাহায্য

দানের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তার মধ্যে এককভাবে পাকিস্তানের ভাগ্যেই জুটেছিল ৬৯১.২০ মিঃ ডলার যার ৭৮ শতাংশই (৫৪১.২০ মিঃ) ডলার ছিল নিছক অনুদান। পক্ষান্তরে ভারতকে দেয়া হয়েছিল মাত্র ৫৬ মিঃ ডলার অর্থাৎ মোট বরাদ্দের মাত্র ২২ শতাংশ এবং এর সব-টাই ছিল ঋণ।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও ভারতের তদানীন্তন উদার মনোভাব এবং পন্ডিত নেহেরুর' স্টেটম্যানশীপের' কারণে উক্ত সমস্যাটির একটি কাঙ্খিত সমাধান সম্ভবপর হয়েছিল। (দেখুন ০১, পৃঃ -২৫৯) পশ্চিম পাকিস্তানে যখন এইভাবে সমস্যার সমাধান হচ্ছে তখন একই সঙ্গে পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্টি হচ্ছিল নতুন এক সমস্যা। "সিন্ধু পানি চুক্তি" স্বাক্ষরের মাত্র এক বছর পর ১৯৬১ সালে ভারত গঙ্গার বুকে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ করে। তখনই পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকৃত সমস্যা সমাধানের জন্য অনুরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। বরং উদাসীন এবং নীরব থেকেছে অথবা সমস্যাকে ব্যবহার করে ভারত বিরোধীতাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লুটার চেষ্টা করেছে। বিশেষতঃ ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পর বন্যা সমস্যার সমাধান, ফারাক্কা সমস্যার সমাধান, ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে কোন গঠনমূলক আলোচনাই অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ ১৯৬৮-৬৯ সালে ভারতের সঙ্গে এসব বিষয়ে একবার আলোচনার সূত্রপাত হয়। কিন্তু এবারো প্রকৃত সমাধানের বদলে কেন্দ্রীয় সরকার ভারত বিরোধীতাকেই ফেনিয়ে তুলে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর দৃষ্টিকে তদানীন্তন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারা থেকে ভিন্ন খাঁতে প্রবাহিত করার প্রয়াস পায়। কিন্তু ততদিনে বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ারে অনেক কিছুই বদলে গেছে। সাধারণ বাঙালী জনগণ বন্যা সমস্যার জন্য ভারতকে দায়ী না করে তখন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা ও বৈষম্যমূলক অর্থ সংস্থানকেই মূখ্যতঃ দায়ী করতে শুরু করেছেন। বন্যার চেয়ে দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়টিই তখন তাদের কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং সবাই ভাবতে শুরু করেছেন যে রাজনৈতিক মুক্তি আগে অর্জিত না হলে বাংলাদেশের বন্যা সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

এরপর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তখন নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অনুকূল সহযোগিতা-মূলক মনোভাব নিয়ে বন্যা ও খরা সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রসর হন। এই লক্ষ্যে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি'র অংশ হিসেবে ১৯৭২ সালে গঠন করা হয় যৌথ নদী কমিশন (জে, আর, সি)। জে, আর, সি-র ঘোষণায় বলা হয় ঃ

"স্থায়ীভাবে গঠিত যৌথ নদী কমিশন উভয় দেশের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ নদ-নদী সম্পর্কে ব্যাপক জরীপকার্য পরিচালনা করবে। বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নানা প্রকল্প প্রণয়ন করবে এবং তা বাস্তবায়িত করবে। দুই দেশের বিশেষজ্ঞরা বন্যার আগাম সতর্কীকরণের ব্যবস্থা বিষয়ে এবং প্রধান নদীগুলিতে অবস্থিত জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গুলি সম্পর্কে বিস্তৃত প্রস্তাবমালা তৈরী করবে। তারা বাংলাদেশ ও ভারতের পরস্পর সংযুক্ত এলাকাগুলির বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রীড (পাওয়ার গ্রিডস) গুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সম্ভাব্যতাও যাঁচাই করে দেখবে। ঘোষণায় আরও বলা হয় এসব যৌথ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হবে "এই অঞ্চলের পানি সম্পদ দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণের স্বার্থে সমতার ভিত্তিতে ব্যবহার করা"। (দেখুন 'ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি'র" ৬নং ধারা)। এতসব লক্ষ্য ঘোষণা সত্ত্বেও পরবর্তীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জে, আর, সি তেমন কোন সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয় নি। তবে একটি বিষয়ে জে, আর, সি-র অবদান অনস্বীকার্য এবং তা হচ্ছে ফারাক্কার বিষয়। জে, আর, সি-র উদ্যোগেই অবশেষে এক্ষেত্রে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়েছিল। ১৯৭৪ সালের মে মাসে শেখ মুজিব যখন দিল্লি সফরে যান তখন দুই দেশের পক্ষ থেকে প্রদত্ত যুক্ত বিবৃতিতে স্বীকার করা হয় যে গঙ্গায় শুষ্ক মৌসুমে যেটুকু পানি প্রবাহ থাকে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারলে একই সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতের প্রয়োজন তা দিয়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং যৌথ বিবৃতিতে সমাধান হিসাবে তখন সুপারিশ করা হয়েছিল গঙ্গায় পানির মোট প্রবাহ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। পরবর্তীতে এই ঘোষণার সূত্র ধরেই ভারত ব্রহ্মপুত্র থেকে পানি স্থানান্তরিত করার জন্য ২০০ মাইল দীর্ঘ, আধা মাইল চওড়া এবং ত্রিশ ফুট গভীর "গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র সংযোগ খাল খননের" প্রস্তাব

দিয়েছিল। কিন্তু দুটি কারণে বাংলাদেশ তখন সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেয় নি। (১) ব্রহ্মপুত্রের পানি স্থানান্তরিত হলে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার ভাটি অঞ্চলে নতুন করে পানি সমস্যার সৃষ্টি হবে এবং (২) বাংলাদেশের মাটির উপর দিয়ে খাল খনন করার মোট সুযোগ ব্যয় লব্ধ উপকারের চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। (উল্লেখ্য যে প্রস্তাবিত খালের এক তৃতীয়াংশ বাংলাদেশের ভূমির মধ্যে পড়বে বলে হিসাব করে বার করা হয়েছিল।) সংযোগ খালের প্রস্তাব প্রত্যাখানের পর স্বভাবতই গঙ্গার স্বল্প পানিতে বাংলাদেশের হিস্যার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গার থেকে অন্ততঃ ৫৫০০০ কিউসেক পানি ভারতের কাছে দাবী করে। তখন তদানীন্তন ভারত সরকার কিছুটা বিব্রত হওয়া সত্বেও বাংলাদেশকে বেশ বড় রকমের ছাড় দিয়েই একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। ১৮ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে ভারত-বাংলাদেশ ফারাক্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং চুক্তিতে পানি বন্টনের ব্যাপারে যে বিন্যাস স্বীকৃত হয়েছিল তা থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। নিম্নে প্রদত্ত ৩নং ছকে পানি বন্টন সংক্রান্ত চুক্তির প্রাসংগিক তথ্যগুলি তুলে ধরা হলো ঃ

ছক-৩

শুষ্ক মৌসুমে ভারত-বাংলাদেশে পানি বন্টন (কিউসেক)

১০ দিনের কালপর্ব (১৯৭৫)	ফারাক্কায় সম্ভাব্য মোট পানি প্রবাহ	ভারতের হুগলী নদীর জন্য বরাদ্দ পানি	বাংলাদেশের জন্য বাদ-বাকি বরাদ্দ পানি
২১ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল	৫৫,০০০	১১,০০০	৪৪,০০০
১লা মে থেকে ১০ই মে	৫৬,৫০০	১২,০০০	৪৫,০০০
১১ই মে থেকে ২০শে মে	৫৯,২৫০	১৫, ০০০	৪৪,২৫০
২১ মে থেকে ৩১ মে	৬৫,৫০০	১৬,০০০	৪৯,৫০০

স্পষ্টতঃই তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ ইপ্সিত ৫৫,০০০ কিউসেক পানি না পেলেও মোট পানির সিংহভাগ অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। হিসাবে দেখা যায় শুস্ক মৌসুমের

শুরুতে বাংলাদেশ পাচ্ছে মোট পানির ৮০ শতাংশ। আর শেষে তা কমে গেলেও তার পরিমাণ দাঁড়াচ্ছে ৭৫'৫৭ শতাংশ। তবে লক্ষণীয় যে এই চুক্তির মেয়াদ ছিল মাত্র এক বছর। ১৯৭৬ সালের ৩০ মে এই চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে তাতে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে এবং ১৯৭৭ পর্যন্ত চুক্তিবিহীন অবস্হায় ভারত এককভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি গ্রহণ ও পানি পরিত্যাগ অব্যাহত রাখে। ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বরে যে নতুন চুক্তি হয় তাতে বাংলাদেশ অবশেষে মাত্র ৩৪,৭০০ কিউসেক পানি নিয়েই (অর্থাৎ ৬২'৫ শতাংশ) সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়, তবে এবার চুক্তির মেয়াদ ছিল দীর্ঘতর—মোট পাঁচ বছর। ১৯৮২-তে চুক্তির মেয়াদ আবার ফুরিয়ে গেলে তখন নতুন কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। তবে ১৮ মাসের জন্য একটি এ্যাড-হক মেমোরেন্ডামের অধীনে ৭৭ সালের নিয়মানুযায়ীই পানি বণ্টন অব্যাহত থাকে। ১৯৮৪ সালে এই মেমোরেন্ডামের সময়সীমা পার হয়ে গেলে ১৯৮৫ সালের শুষ্ক মৌসুম পুনরায় চুক্তিবিহীন অবস্থায় অতিবাহিত হয়। কিন্তু ১৯৮৫-র নভেম্বরে পুনরায় এ্যাড-হক ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য একই ধারায় একটি যৌথ মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষরিত হয়। উল্লেখ্য যে চলতি ১৯৮৮-র নভেম্বরে এটিরও মেয়াদ শেষ হয়ে যেতে চলেছে।

বস্তুতঃ এ কথা এখন খুবই পরিস্কার যে বাংলাদেশ ও ভারত উভয়ের প্রয়োজন পুরণের মত পানি শুষ্ক মৌসুমে গঙ্গায় পাওয়া যাবে না। সুতরাং এ্যাডহক চুক্তির মাধ্যমে এই সমস্যার কোন প্রকৃত সমাধান নাই। বিশেষতঃ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশের পানির চাহিদা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে পূর্বোল্লেখিত স্থায়ী সমাধানটি অর্থাৎ নেপালে জলাধার নির্মাণ করে সেখানে বর্ষার পানি ধরে রেখে একই সঙ্গে বন্যা ও খরা সমস্যার সমাধানের প্রস্তাবের যৌক্তিকতা পুনরায় সর্বমহলে উপলব্ধ হচ্ছে। এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে ভারতের প্রস্তাবিত "সংযোগ খাল পরিকল্পনার" বিপরীতে উল্লিখিত "জলাধার নির্মাণ প্রস্তাব" সম্পর্কে ভারত আজ পর্যন্ত কখনো কোন নীতিগত আপত্তি জানায়নি! তবে ভারতের এ বিষয়ে বক্তব্য হচ্ছে—বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে নেপাল-ভারত সহযোগিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ আঞ্চলিক সহযোগিতার বিষয়টিকে

অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তবে আশার বিষয় এই যে ১৯৮৬ সালে ভারতের মনোভাব পরিবর্তন হয় এবং ভারত-বাংলাদেশ উভয়ই যৌথভাবে নেপালের কাছে জলাধার নির্মাণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাত্ত সরবরাহের অনুরোধ জানায়। উপরন্তু ১৯৮৭ সনের জানুয়ারী মাসে ভারত, বাংলাদেশ ও নেপাল এই তিন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠকে জলাধার নির্মাণের প্রস্তাবের কার্যকারীতা ও সম্ভাব্যতা বিষয়ে একটি 'ওয়ার্কিং পেপার' তৈরী করার দায়িত্ব ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের উপর অর্পিত হয়।

এই পর্যন্ত এসে আমাদের আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা আজ থমকে দাঁড়িয়েছে। স্থায়ী সমাধানের উপরোক্ত প্রস্তাবটি নিয়েও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে নানা তর্ক-বিতর্ক অব্যাহত আছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিন দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে একটি রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া এরকম জটিল সমস্যার কোন সহজ সমাধান নেই। তবে এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দাতা রাষ্ট্র ও সংস্থাগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তারা যদি উদারভাবে এগিয়ে আসেন তা'হলে অনেক সমস্যার সমাধানই সহজতর হয়ে পড়বে। আর যদি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক ভূ-রাজনীতির ট্র্যাডিশনাল ধারা অনুসরণ করে এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আগ্রহী হন তা'হলে অদূর ভবিষ্যতে সমস্যার পাহাড় আরও উচু বই নীচু হবে না!

বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এযাবৎ যেসব খুঁটি-নাটি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার কিছুটা বিবরণ আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করেছি। এইখানে আমরা খুঁটি-নাটিতে না গিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার মৌলিক "স্ট্র্যাটেজিক", "প্রাতিষ্ঠানিক" এবং "অর্থনৈতিক" দিকগুলো শুধু তুলে ধরবো।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে আমাদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রশক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য তেমন একটা স্বচেষ্ট ছিলেন না। ১৯৫৪ সালে এতদাঞ্চলে যখন ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল (মোট আবাদী জমির ষাট ভাগ তখন প্লাবিত হয়েছিল) তখনই একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে কিছুটা নড়-চড়া শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বরে গঠন করা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান বন্যা কমিশন"। এই কমিশনের উদ্যোগে স্বল্পমেয়াদীভাবে নদীর কিনারায় কিছু বাঁধ

(এমব্যাংকমেন্ট) নির্মাণ ও নালা (ড্রেইনেজ) খননের কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এটাই বলা যায় প্রত্যক্ষভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে প্রাথমিক সরকারী উদ্যোগ। এরপর ১৯৫৬ সালের শেষ দিকে জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি টেক্‌নিকাল সাহায্য মিশন পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা সমস্যা পর্যালোচনার জন্য এদেশে আসেন। ১৯৫৭ সালে তারা তাদের রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টই পরবর্তীতে ক্রুগ মিশন রিপোর্ট নামে অনেক খ্যাতি-অখ্যাতি কুড়িয়েছে। এই রিপোর্টে মূলতঃ ধরে নেয়া হয় যে নদীর পানিকে নদীতে সীমাবদ্ধ রেখেই বন্যা সমস্যার সমাধান করতে হবে। অর্থাৎ রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অতিরিক্ত গুরুত্ব এসে পড়েছিল নদীর পুনঃখনন বা ড্রেজিং এবং নদীর তীরে সুদীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের উপর। (দেখুন, ২০, পৃঃ ২) তবে রিপোর্টে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার জরুরী প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করা হয়। পরবর্তীতে এই রিপোর্টের সুপারিশ অনুসারেই গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান পানি ও শক্তি উন্নয়ন সংস্থা। তবে ১৯৫৯ সালে এই সংস্থাটি সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে 'পূর্ব পাকিস্তান বন্যা কমিশনের" বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়।

এরপর ১৯৬৩ এবং ১৯৬৪ সালে পর পর দুইজন বিশেষজ্ঞ জেনারেল জন হার্ডিন (মিসিসিপি নদী কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান) এবং অধ্যাপক জে. থীজসে বন্যা সমস্যা পর্যালোচনার জন্য এদেশে আসেন এবং নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে জেনারেল হার্ডিনের বক্তব্য মূলতঃ ক্রুগ মিশনের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি হলেও অধ্যাপক থীজসে ভিন্নধর্মী কিছু কথা তখন বলেছিলেন। তিনি নদীকে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম ভাবে নদীর দুই পাড়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সম্ভাব্য নানা বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তিনি উল্লেখ করেন অববাহিকা অঞ্চলের নদীর গতিপথ, প্রবাহিত পানির পরিমাণ, জমাকৃত পলির আগমনের হার ইত্যাদি সবকিছুই যেহেতু খুবই অনিশ্চিত সেহেতু নিছক বাঁধ না দিয়ে বরং নদীর পানিকে যতদূর প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেয়া যায় ততদুর প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ দেয়া উচিৎ। এই উদ্দেশ্যে শাখা নদী, খাল, বিল, নালা ইত্যাদি পানি প্রবাহের স্বাভাবিক পথ গুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের উপরেই তিনি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তবে তদানীন্তন

আমলাতন্ত্র তার এই সতর্কবাণীতে তেমন একট আমল দেননি। ১৯৬৪ সালের পর "পূর্ব পাকিস্তান পানি ও শক্তি উন্নয়ন সংস্থা" বিংশবর্ষ ব্যাপী একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। মূলতঃ ক্রুগ মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী স্থির করা হয় যে ১৯৮৫ সাল নাগাদ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনার উভয় তীরে মোট ২০০০ মাইল লম্বা বাঁধ দেয়া হবে। আশা করা হয় যে এসব বাঁধের দ্বারা ৮০ লক্ষ একর জমি বন্যা থেকে রক্ষা পাবে এবং পাশাপাশি দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৯৭৫ সাল নাগাদ ১০ লক্ষ একর এবং ১৯৮৪ সাল নাগাদ আরো ৩০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে। বস্তুতঃ বাস্তবে এক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের হার হচ্ছে খুবই কম। ১৯৮৫ সাল নাগাদ বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পসমূহ তথা বাঁধের সাহায্যে রক্ষিত মোট জমির পরিমাণ হচ্ছে প্রায় ৪৮ লক্ষ একর। অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬০ শতাংশ। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বাস্তবে ১৯৮৫ সাল নাগাদ সেচ সম্প্রসারিত হয়েছে মাত্র ৪.৭৫ লাখ একর জমিতে অর্থাৎ পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ১২ শতাংশ অর্জিত হয়েছে! (বিস্তৃত তথ্যের জন্য দেখুন ১৫, পৃঃ-৪।) এই বিশাল কাজকে মাত্র ৩টি ব্যারেজ এবং ৫১টি অতি বৃহৎ-ব্যয়বহুল প্রকল্পের মাধ্যমে সমাপ্ত করার কথা ভাবা হয়। কিন্তু এসব প্রকল্প খুব উৎসাহ নিয়ে প্রথমদিকে শুরু হলেও দ্রুতই অর্থাভাবে তা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণই অর্থাভাবের জন্য দায়ী ছিল না। বস্তুতঃ ১৯৬৬ সালে বিশ্বব্যাংক এসব ক্ষেত্রে চালু প্রকল্পগুলির যে প্রাথমিক মূল্যায়ণ তখন করেছিলেন তাতে তারাও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে নদী অববাহিকা অঞ্চলে নদীর আচরনের ব্যাপারে যে সামগ্রিক অনিশ্চয়তা বিরাজ করে তাতে এ ধরণের দীর্ঘমেয়াদী বৃহদায়তন ব্যয়বহুল প্রকল্প যত কম হাতে নেয়া যায় ততই ভাল। এরপর ১৯৭০ সাল নাগাদ বিশ্বব্যাংক বিশেষজ্ঞরা নতুন পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিতে নয় খন্ডে সমাপ্ত একটি রিপোর্ট তৈরী করেন। এটি ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার পর "ল্যান্ড এণ্ড ওয়াটার রিসোর্সেস : সেক্টর স্টাডি" শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে পূর্ববর্তী মহাপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বৃহদায়তন প্রকল্পগুলির থেকে গুরুত্ব সরিয়ে এনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়—

১। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের উপর।

২। কম ব্যয়ে দ্রুত সম্পন্নযোগ্য বাঁধ নির্মাণের উপর।

৩। মাধ্যাকর্ষণ জনিত স্বাভাবিক পানি প্রবাহের ব্যবহারকেই কাজে লাগানোর জন্য ছোট-খাট খননকর্মের উপর এবং

৪। যেসব বৃহৎপ্রকল্প ইতোমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হয়ে গেছে সেগুলি অবিলম্বে শেষ করার উপর।

বস্তুতঃ ১৯৭২ থেকে এই মূল স্ট্র্যাটেজী অনুসরণ করেই কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পেছনের অসমাপ্ত কাজের বোঝা অতিমাত্রায় থাকায় এই গুরুত্ব পরিবর্তনের বিষয়টি পরিকল্পনায় ঠিকভাবে প্রতিফলিত করা সম্ভব হয়নি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অতি উৎসাহ নিয়ে যত্র-তত্র খাল কেটে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিকে কার্যকরী করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। তবে সেখানেও সামগ্রিক বিচারে বৃহদায়তন প্রকল্পের মৌল গুরুত্ব অটুট থেকে যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রস্তাবে দেখা যায় যে নতুন রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ পুরাতন ক্রুগ মিশন রিপোর্টের ধারাতেই প্রত্যাবর্তন প্রয়াসী। উপরোক্ত বক্তব্যের সমর্থনে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এযাবৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য যে ধরনের বিনিয়োগ বিন্যাসের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে তা তুলে ধরা হোল। নিম্নের ৪নং ছক থেকে উদ্বেগজনক একটি প্রবনতা উদ্ঘাটিত হয়। লক্ষ্য করা যায় যে সমগ্র পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে ব্যয় বরাদ্দের অপেক্ষিক গুরুত্ব ক্রমাগতই হ্রাস পেয়ে এসেছে। মুজিব আমলে প্রণীত পরিকল্পনায় তা ছিল ৭·২০ শতাংশ, জিয়া-সাত্তার সরকারের আমলে প্রণীত পরিকল্পনায় তা কমে হয় ৬.০১ শতাংশ এবং অবশেষে বর্তমান সরকারের আমলে তা কমে সর্বনিম্ন ৫.৩১ শতাংশে উপনীত হয়েছে। এছাড়া ছক থেকে আরও দেখা যায় যে বৃহদায়তন-ক্ষুদ্রায়তন প্রকল্পের মধ্যে বিনিয়োগ ভারসাম্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পূর্ববর্ণিত ধারানুসারে বদলিয়েছে।

বাংলাদেশের বন্যা সমস্যা : অমিমাংসিত ইস্যুসমূহ

বন্যা সমস্যার কারণ, সম্ভাব্য সমাধান এবং এযাবৎ গৃহীত জাতীয় আন্তর্জাতিক পদক্ষেপসমূহের দীর্ঘ পর্যালোচনা থেকে অনেকগুলি

ছক-৪

বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য বিনিয়োগ ব্যয়ের বিন্যাস

পরিকল্পনা বছর	পরিকল্পিত বিনিয়োগের সর্বমোট আয়তন (কোটি টাকা)	বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে বরাদ্দ বিনিয়োগ (মোট বিনিয়োগের শতাংশ)	বৃহদায়তন প্রকল্পে বিনিয়োগ (শতাংশ)	ক্ষুদ্রায়তন ও মাঝারি প্রকল্পে বিনিয়োগ (শতাংশ)	অন্যান প্রকল্পে বিনিয়োগ (শতাংশ)
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩—৭৮)	৪৪৫৫	৩২১.২০ (৭.২০)	৩০৯.৫০ (৯৬.৩৫)	১১.৭০ (৩.৬৫)	—
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮০—৮৫)	১৭২০০	১০৩৫ (৬.০১)	৫০৫ (৪৮.৭৯)	৩৭৫ (৩৬.২৩)	১৫৫ (১৪.৯৮)
তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৮৫—৯০)	৩৮৬০০	২০৫০ (৫.৩১)	১৪৭৪ (৭১.৯০)	৩৯৬ (১৯.৩১)	১৮০ (৮.৭৯)

উৎস : দেখুন ৫,৬ এবং ৭

* অন্যান্য বলতে এখানে গবেষণা ও জরীপ, ড্রেজিং এবং শহর রক্ষার জন্য এককালীন খরচ বোঝানো হয়েছে।

আমিমাংসিত বিষয় আমাদের সামনে এসে ধরা পড়ে। সেগুলি হচ্ছে—

১. বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বাংলাদেশের যে ধরনের পররাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিৎ সে বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে মতভেদ রয়েছে। ভারত বিরোধী ট্রাডিশনাল ধারার বিপরীতে সমতা ভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সহযোগিতামূলক নীতি আজও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি অর্জন করেনি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি-সম্পন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ অব্যাহত রয়েছে। ফলে পরিস্থিতি অনিশ্চিত থেকে যাচ্ছে।

২. বন্যা ও খরা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে ভারতীয় তরফের সংযোগ খাল খননের প্রস্তাব অথবা নেপালে জলাধার নির্মাণের প্রস্তাব বিষয়ে এখনো দেশ পর্যায়ে এবং এমনকি একই দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ পর্যায়েও বিতর্কের মিমাংসা হয়নি। বস্তুতঃ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে "জলাধার নির্মাণ" বিষয়ে মূলতঃ যেসব আপত্তি তোলা হয় সেগুলি নিম্নরূপ—

ক) এই প্রকল্প কতদিন স্হায়ী হবে সে ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়। যদি নির্মাণের ১০-২০ বছর পরেই প্রকল্পটি আবার অকেজো হয়ে যায় তাহলে আরো ১০-১৫ বছর ধরে বিপুল ব্যয়ে প্রকল্পটি নির্মাণ করার কোন যৌক্তিকতা থাক্‌তে পারে না।

খ) প্রকল্পটি যেহেতু ভিন্ন দেশ নেপালে/ভারতে অবস্হিত হতে হবে সেহেতু পরবর্তীতে বাংলাদেশ ভারত/নেপালের উপর পানির ব্যাপারে অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

গ) এ ধরনের আন্তর্জাতিক প্রকল্পের ব্যয়ভার বহন এবং সুফলের ভাগ-বাঁটোয়ারা বন্টনকে কেন্দ্র করে সবগুলি সংশ্লিষ্ট পক্ষের ঐক্যমতে পৌছানো খুবই কঠিন ব্যাপার।

ঘ) আন্তর্জাতিক মহাজনেরা দীর্ঘদিন ধরে এত বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য দিতে রাজী নাও হতে পারেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই প্রস্তাবটি সম্পর্কে বিতর্ক শুধু টেকনিকাল সম্ভাব্যতা বিচারের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে জটিল এক গুচ্ছ তাৎপর্যপূর্ণ ভূরাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক বিতর্কাবলী।

৩. আমাদের দেশে আভ্যন্তরীণ অস্হায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণমূলক পদক্ষেপসমূহের কোন পদক্ষেপকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে—বৃহদায়তন—

দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ না কি ক্ষুদ্রায়তন—স্বল্পমেয়াদী অথবা উভয়ের কাম্য বিন্যাসই বা কি হবে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোন দিকে ধাবিত হওয়া উচিৎ এসব বিষয়েও আজ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে কোন যুক্তিসংগত মিমাংসা হয়নি। আমরা কি ব্যাপক ক্ষুদ্র-বৃহৎ-মাঝারি খনন কাজের দিকে যাবো, নাকি ব্যারেজ নির্মানের উপর অধিক গুরুত্ব দেব, নাকি নদীতে ড্রেজিং চালাবো, নাকি সবগুলি কাজই একই সঙ্গে শুরু করবো বা কোন্‌টির কতটুকু অগ্রাধিকার হবে সেসব বিষয়ে আজ পর্যন্ত কোন সুসমন্বিত মিমাংসা হয়নি।

৪. আভ্যন্তরীণ বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কাম্য বিন্যাস ও অগ্রাধিকারের প্যাটার্ণের সমস্যার মিমাংসার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমগ্র পরিকল্পনায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকৃত ও যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের সমস্যা। সমগ্র পরিকল্পনার মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ অর্থবরাদ্দ করে কি বন্যা সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর আজও অমিমাংসিত।

৫. বন্যার সঙ্গে যোগ্যতার সঙ্গে সহাবস্থানের জন্য কতকগুলি পরিপূরক ব্যবস্থা এখনই নেয়া সম্ভব যেমন—বনায়ন, পূর্বসতর্কীকরণ, উচু স্থানে আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা করা, গভীর পানিতে বাঁচতে সক্ষম এরকম ফসল চাষ, ত্বরিত গণতান্ত্রিক ত্রাণ বন্টনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা, গৃহ ও অন্যান্য শক্ত কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের সময় আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ, রাস্তা-ঘাট-রেলওয়ে নির্মাণের সময় উপযুক্ত সংখ্যক পানি প্রবাহ পথের ব্যবস্থা রাখা, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ট্র্যাডিশনাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীতে এসব পদক্ষেপের গুরুত্ব এখনো নেই বা থাকলেও তা খুবই স্বল্প। কিভাবে এসবক্ষেত্রে মনোযোগ বাড়ানো সম্ভব সেটি আজকের একটি জরুরী প্রশ্ন।

৬. সর্বশেষ 'ইস্যু' হচেছ 'বন্যা নিয়ন্ত্রণ' কর্মসূচী কি ভাবে বাস্তবায়িত হবে? এটা কি পুরাতন কায়দায় বিদেশী বিশেষজ্ঞদের উপর নির্ভর করে ব্যয়বহুল পুঁজিঘন ধারায় অগ্রসর হবে এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া ধারায় আমলাতান্ত্রিকভাবে কার্যকরী হবে নাকি জনগণের সৃজনশীলতা ও গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণকেই এক্ষেত্রে মুখ্য গুরুত্ব দেয়া হবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় কায়দা অনুসরণের জন্য আবার প্রয়োজন হবে সমবায়ী গ্রাম এবং তার পূর্বশর্ত হচ্ছে

বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তন। সুতরাং বন্যা সমস্যার সমাধানের প্রশ্নটি কি এইদিক থেকে জাতীয় রাজনীতির গতিবিধির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে না? কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তন ছাড়া কিছুই সম্ভব না—এই বক্তব্যও কি একটি ক্লিশ বক্তব্যে পরিণত হয়নি?

৭. এছাড়াও আমাদের দেশের জন্য আরো কতকগুলি অমিমাংসিত বিবিধ ইস্যু সমান গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখের দাবী রাখে। যেমন—বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে আশংকা করা হয়েছে যে ভবিষ্যতে দুই হাজার সাল নাগাদ আমাদের পানি ব্যবহার এমন মাত্রায় বৃদ্ধি পাবে যে তখন সারা দেশেই বিশেষতঃ খরা মৌসুমে ভূউপরিস্থ পানি সরবরাহে চরম ঘাটতি (Absolute Deficit) দেখা দিতে পারে। তখন বর্ষা মৌসুমের উদ্বৃত্ত পানি খরা মৌসুমের জন্য আগে ভাগে ধরে রাখার ব্যবস্থা করতেই হবে নচেৎ খরা মৌসুমে সারা দেশের কৃষি উৎপাদন পানির অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যারা এই পরিণতি আশংকা করছেন তাদের মধ্যে কারো কারো পরামর্শ হচ্ছে একটু ব্যয়বহুল হলেও দীর্ঘমেয়াদী বিবেচনায় বর্তমানে আমাদেরকে ভূউপরিস্থ পানি ব্যবহার কমিয়ে ভূনিম্নস্থ পানির দিকেই ক্রমশঃ ঝুঁকতে হবে। অন্যদিকে আবার কারো কারো মত হচেছ শেষ পর্যন্ত আমাদের দেশে বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালের উদ্বৃত্ত পানিকে ভিন্ন পথে প্রবাহিত করা ও ধরে রাখা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নেই।

এক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিবিধ পর্যায়ের ইস্যু হচ্ছে—কোন নদীর পানি আমাদের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। খরা ও বন্যা নিবারণের জন্য কোন নদীর উপর আমাদের অধিকতর মনঃসংযোগ করা উচিৎ গঙ্গা না ব্রহ্মপুত্র না মেঘনা?*

উপসংহার

বস্তুতঃ 'বন্যা ৮৮' চারদিকে যে আলোচনার ঝড় তুলেছে তার একটি যথাযথ পরিণতি ও সংশ্লেষণ হওয়া উচিৎ। তা না হলে এলো-মেলো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে পড়ে পাঠককূল হাবু-

* উল্লিখিত ৭টি অমিমাংসিত বিষয়ে বা/এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমতের জন্য দেখুন বিশেষজ্ঞদের মন্তব্য" শীর্ষক অধ্যায়ে উদ্বৃত মন্তব্যসমূহ।

ডুবু খাবেন এবং বিভ্রান্তি আরও বাড়তেই থাকবে।

বর্তমান প্রবন্ধে তাই এ পর্যন্ত উচ্চারিত বিভিন্ন বক্তব্যের একটি মোটামুটি পর্যালোচনামূলক সংশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে অন্ততঃ মূল বিতর্কিত ইস্যুগুলিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে প্রশ্ন উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা সমাধানের বিষয়ে কিছু ইঙ্গিত দেয়ারও চেষ্টা করা হয়েছে। সমস্যার জটিলতার কারণে কোন কোন ইস্যুতে আলোচনাকে আমরা মুক্ত রেখে দিয়েছি। তবে আমাদের সামগ্রিক পক্ষপাতিত্ব আমরা গোপন করিনি। অবশ্য একথা ঠিক যে আরও তথ্য ও বিশেষজ্ঞদের আরও গভীরতর মতামত নিয়েই আমাদেরকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পেঁাছাতে হবে।

কিন্তু অন্ততঃ এটুকু আমরা এখনই বলতে পারি যে নিয়তিবাদী হয়ে আমরা বসে থাকতে পারি না। রিলিফ মানসিকতা নিয়ে সাম্রাজ্য-বাদী সাহায্যের উপর নির্ভর করে চিরকাল ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে বেঁচে থাকতে আমরা চাই না। আর এই বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যুগে প্রকৃতিকে বশ করা সম্ভব নয় একথা বিশ্বাস করতে আমরা প্রস্তুত নই। আমাদের বিপুল পরিমাণ জনসম্পদ সুসংগঠিত করার মত নিষ্ঠাবান সংগঠক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে সহজেই বন্যা সমস্যার অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। জাতীয় পর্যায়ে গণচেতনাকে গণউদ্যোগে রূপান্তরিত করে বন্যা সমস্যার নিয়ন্ত্রণের ফর্মূলা কোন নতুন চমকপ্রদ বুলি নয়। এইভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ এই এশিয়াতেই আছে। চীনের অভিজ্ঞতা আমরা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। চীনের ঐ অন্যান্য অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ফরাসী অধ্যাপক রেনে-দুঁমো যে কথা বলেছিলেন তার উদ্ধৃতি দিয়েই এই প্রবন্ধ শেষ করতে চাই।

"মৌসুমী মহাদেশ এশিয়ার সর্বোচ্চ সম্পদ হচ্ছে তার বিশাল জনসম্পদ। তার পশ্চাদপদতার মূল কারণও হচ্ছে এই শ্রমশক্তির অদক্ষ নিয়োজন। শ্রমশক্তি হচ্ছে একটি বিনাশী পণ্য (Perishable)। আজকে তা ব্যবহার না করলে আগামীকাল তার পুনর্ব্যবহার সম্ভব নয়। যদি আধুনিক যন্ত্রপাতি নাও থাকে, তবুও লঘু মৌসুমে খামারে যখন কাজ থাকে না তখন কৃষক এমন কতকগুলি কাজ করতে

পারেন যা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকতর উৎপাদনশীল ব্যবহার ত্বরান্বিত করবে। বৃহৎ জলসেচ প্রকল্প, পানি নিষ্কাশন প্রণালী এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের কাজে এই শ্রম নিয়োগ করলে খাদ্য উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং বর্ধিত খাদ্য ভোগ করে শ্রমশক্তি পরবর্তী বছর আরও ভালভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। এইভাবে উৎপাদনের সর্পিল অগ্রগতি (Ascending Spiral of Production) নিশ্চিতভাবে সূচীত হবে। যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে ভারতের চেয়ে (দু'মো এ কথা বলছেন ১৯৫৪ সালে—লেখক) অনগ্রসর চীন ১৯৫০–৫২ কালপর্বে প্রায় ১২ কোটি সক্ষম নর-নারীর শ্রমশক্তিকে ভূমি উন্নয়নের প্রকল্পসমূহে (Land Development Schemes) কাজে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিল। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নানা বিশেষ দুর্বলতার থাকলেও সাধারণভাবে এ কথা সত্য যে এখন মনে হচ্ছে চীনে মহাদুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্নের দিন শেষ হয়ে গেছে। যে বন্যা সারা প্রদেশের ফসলকে এক সময় বিনষ্ট করে ফেলতো, তাকে এখন আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই।" (দেখুন ১, পৃঃ-১৬২)।

তথ্যপঞ্জী

1. Rene Dumont, ***Types of Rural Economy* : *Studies in World Agriculture***, Methuen and Co., London, 1957.
2. জেমস্ টেলর, 'কোম্পানী আমলে ঢাকা,' বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
3. George Ernest Glos, ***International Rivers : A Policy-Oriented Perspective***, Singapore, 1961.
4. ***Foreign Policy of Bangladesh : A Small State's Imperative***, edited by Emajuddin Ahmed, University Press Limited, 1984.
5. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh : The Third Five *Year Plan* : *1985-90*, Dhaka December, 1985.
6. Ibid, *The First Five Year Plan* : *1973-78*, Dhaka, November, 1973.
7. Ibid, *The Second Five Years Plan* : *1980-85*, Dhaka, May, 1983
8. I. B. R.D. *Land and Water Resources Sectiion Study* (in nine volumes), *Vol-VIII*, *FLOOD. Problem*, December 1, 1972.
9. Ibid, *Volume VII*, *Water*, December, 1972

10. Ibid, Volume-I, *Detailed Sector Review* December 1, 1972.
11. Mosharaff Hossain, A.T.M, Aminul Islam and Sanat Kuma· Saha, *Floods In Bangladesh : Recurrent Disaster And People's Survival*, Uiversity Research Centre, Dhaka, August, 1987.
12. Ferdous Ahmed and Ainun Nishat, *Evaluation of Flood Control Drainage Components of Chandpur Irrigation Project*, Seminar Paper presented at the seminar on *Floods and Bangladesh* organized by The Institution of Engineers, Bangladesh, October 31,1987.
13. B. M Abbas A. T., *International Cooperation For Flood Control*, Ibid October, 1987
14. Ibid, *Water Resources Development In Bangladesh : Problems and Perspectives*, August, 1988.
15. M. A. Matin (Seminar Paper), *Some Aspects, of 1987 Flood*, October 31, 1987.
16. A.N.H Akhtar Hossain and M. Shahjahan *Medium AND Small Scale Flood Control And Drainage Projects*, October, 31,1987.
17. Dr. Md. Zahurul Islam, *A Report On A Short Visit To the Flood Control Embankments of Rangpur, Gaibandha, Lalmonirhat And Kurigram Districts*, Dhaka, 1986.
18. জহিরউদ্দীন চৌধুরী, 'বন্যা সমস্যা মোকাবিলা : একটি পর্যালোচনা ও কিছু সুপারিশ,' ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮৭.
19. Muhammad F. Bari, *National Water Plan : An Overview* September 2,1988.
20. Masroor-ul Haq Siddiqi, *Flood Control in Bangladesh* : An *Appraisal of past Efforts*, Oct. 31st, 1987.
21. বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশন গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, 'গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ত্রৈ-বাৎসরিক পরিকল্পনা (১৯৮৮ – ১৯৯০),' ডিসেম্বর, ১৯৮৭.
22. Md. Zahurul Islam and Md. Abul Kalam Azad, *A Report on a Short Visit to Naogaon-Atrai And Chalan Beel Flood Control Embankments*, Bangladesh University of Engineering And Technology, Dhaka.
23. Md. Zahurl Islam. *A Report On a Short Visit To Teasta Project Irrigation Conals*, Dhaka, 1988,

24. Md. Zahurul Islam and Abul Kalam Azad, *A Report On a Short visit To Brahmaputra Right Bank Embankment At Serajgonj*, Dhaka, 1986.
25. Q. K. Ahmed and Monowar Hossain, *Development Through Self-Help : Lessons From Ulashi*, BIDS, April, 1987.
26. *Dhaka Courier*, September 9-15, 1988, Vol-5 Issue-5.
27. দৈনিক সংবাদ, ৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, মোনাজাতউদ্দিন কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট।
28. দৈনিক সংবাদ, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮, ইকবাল মতিন লিখিত উপসম্পাদকীয় "বন্যা সমস্যা ঃ সমাধানের পথ"।
29. সাপ্তাহিক একতা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮। '২০০ বছরের বন্যা' শীর্ষক রিপোর্ট।
30. রেহমান সোবহান, "দ্য পলিটিক্যাল ইকনমি অফ সাউথ এশিয়ান রিজিওনাল ইকনমিক কোঅপারেশান," বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, ১১—২৩শে জানুয়ারী, ১৯৮৫।
31. Aloys Anthur Michel, *The Indus Rivers : A Study of the Effects of Partition* London, 1967.